রক্তকমল

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

মায়াপুরী (ছোট গল্প)	১॥০
সোনার হরিণ (ছোট গল্প)	১৸৵০
রমলা (উপন্যাস)	১৸০

পুস্তক সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা ১[illegible]৩৭

রক্তকমল

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বরদা এজেন্সী
১২।১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ
বরদা এজেন্সী
১২।১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

দাম এক টাকা নয় আনা

কলিকাতা, ৬৫ নং সারপেণ্টাইন লেন
ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

জীবনের

পরম পুণ্যময়ী স্নেহসুধাময়ী

স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

অশোক





রক্তকমল

—০—

অশোক

—•—

অশোকের কথা

আমি আর রিভল্‌ভারটা পাশাপাশি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' আছি। ভাব্‌ছি,—রিভল্‌ভারটা বল্‌ছে—আর কেন বন্ধু, বল, এক নিমেষে তোমার সব ভাবনা শেষ করে' দিই। হাঁ, বন্ধু, তোমার একটি অগ্নিচুম্বন দিয়ে আমাকে সব বোঝা হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই দিতে পার্‌বে—in that sleep of death what dreams may come!

পুলিসকমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে যেন বল্‌ছে,—না, যেয়োনাক। ওতে লিখ্‌লুম, তোমরা যে অ্যানার্‌কিস্টকে ধর্‌বার জন্যে কত কাণ্ডই না করেছ, কাবুল পর্য্যন্ত ডিটেক্‌টিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল সকালে এখানে দেখ্‌লে নিশ্চয় খুব খুসী হবে না, পুরস্কারের মোটা টাকাটা ভাগ্যে জুটল না। আমি স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকে

বিনাশ করছি, নিজের দলের ষড়যন্ত্রে বা প্রতিহিংসায় কেউ আমায় মারেনি।

আর একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখ্‌লে হয়, দাদাকে। তাঁকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিয়ে এসেছি,—শুধু যদি তিনি কয়েক হাজার টাকা পাশের ঘরের তরুণ কবিটিকে দেন। সেই সাতমহল জমিদার-বাড়ী,—এক ঝিল্লিরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর ছোট ছেলেটি যখন সুখসম্পদ্ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ পথে প্রলয়ের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে বাড়ীখানি নদীর কলকলে আম্রবনের মর্ম্মরে যেমন করে' ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখানি মনের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে। বায়স্কোপের দীর্ঘ ফিল্‌ম্ হ'তে মাঝে মাঝে কাটা অসংলগ্ন টুক্‌রো ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত হারাণ ক্ষণ, কত ভুলে-যাওয়া ঘটনা, কত টুক্‌রো কথা, ছড়ান হাসি চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে—আমের মুকুলের মত সেই যে ছেলেটি গ্রীষ্মের দুপুরে খেয়াঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে' পারাপার দেখ্‌ত; বর্ষারাতে বিদ্যুৎ-চমকে কেঁপে মায়ের কোলে লুকিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হ'ত,—সেই পূজোর সময় একবার বলির ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম, সেই যে বল লেগে কপালটা কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণটা কি সজল চোখে চেয়েছিল; হেমন্তের দুপুরে অঙ্কের পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোৎস্নার প্রথম-দেখা মুখখানি,—শিরীষফুলের মত সে সাম্‌নের পথ দিয়ে চলে' গেল, আমার চোখে সোণার কাঠি বলিয়ে, সারা দুপুর গাছপালার ঝর্‌ঝরানিতে আকাশ-আলোর কাঁপনে কিশোর মন বীণার মত বাজ্‌তে লাগ্‌ল, সে পরীক্ষায় ফেল হয়েছিলুম—ব্যর্থ হওয়ার পরম আনন্দ এমন করে' কোনদিন অনুভব করিনি।

ঠিক ভাব্‌তে পার্‌ছি না, টুক্‌রো ঘটনাগুলো এলোমেলো আস্‌ছে. মাথাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার মধ্যের instinct of self-preservation সহজে হার মান্‌তে চাচ্ছে না, অতীত জীবনের রঙীন মধুর স্মৃতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ।

ভাল লাগে না ভাব্‌তে। সুন্দরী পৃথিবী তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র দিয়ে একদিন আমায় ভুলিয়েছিল। হৃদয়ের পেয়ালা যখন প্রেমে সৌন্দর্য্যে কানায় কানায় ভরে' উঠেছে, তৃষিত তপ্ত ওষ্ঠ দিয়ে পান কর্‌তে গেলুম, নিমেষে পেয়ালা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল, স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তারপর স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংসের লীলায় মাত্‌লুম, হৃদয় পুড়ে' গেল, জাগ্‌ল না —কেউ জাগ্‌ল না। মৃত্যুর বাঁশি শুনে আমরা রুদ্রের যে ক্ষ্যাপা দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম. সেই সঙ্গীদের কেউ মরেছে, কেউ জেলে, কারো বিচার হচ্ছে, কেউ বনজঙ্গলে লুকিয়ে।

বুঝ্‌লুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিজ্বালা, দুঃখসুখের মায়াচক্র, সৃষ্টির ভাঙাগড়া খেলা। বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পূর্ণচন্দ্র সুধাভাণ্ড বুকে করে' দিকে দিকে মদিরাধারা প্রবাহিত করে' চলেছে। প্রথম যৌবনে বসন্তের জ্যোৎস্না-ধারাতপ্ত কত রাত্রি গানের সুরে ফেনিয়ে উপ্‌চে উঠেছে। এই চাঁদের আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে তুল্‌ত; আজ এ জ্যোৎস্না চোখে একটু মায়া লাগায় না, মনে হয় এ যেন বিশ্বমাতার অশ্রুজল গলে' ঝরে পড়্‌ছে। কাল সারারাত ওই বস্তি হ'তে যে পুত্রহীনা কুলি-নারীর গুম্‌রে গুম্‌রে কান্না শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে।

জ্যোৎস্না! এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত দুলিয়ে দিলে। আমার শৈশবের রূপকথার রাজকন্যা আজ কোথায় আছে জানি না। শুধু যদি তার মন-জাগানো মুখের মিষ্টি হাসিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি একবার দেখ্‌তে পেতুম তবে যাবার এ ক্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা-রাত্রির মত মধুর হ'ত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা কত মূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে এলোমেলো ভেসে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। বকুল-গাছের দোল্‌নায় দুল্‌তে দুল্‌তে কি ভ্রূকুটি করে' সে চেয়েছিল! তার জন্মদিনে আমার জলখাবারের পয়সা জমিয়ে যে সেফ্‌টিপিন দিয়েছিলুম, কি মিষ্টি হেসে নিয়েছিল।

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই ঊনত্রিশ বছরের আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে,—আনন্দ কি পাওনি? জীবনের সে দুটি বছর প্রেমস্বপ্নে যৌবনের উদ্দামতায় ভরপুর ছিল। জমিদারের ছেলে, প্রেসি-ডেন্সী কলেজে পড়ি, আমার মত সৌখীন, সুন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল না। জ্যোৎস্নারা তখন কল্‌কাতায় এসেছে,—সে চঞ্চলা বালিকা নয়, সলজ্জা কিশোরী। তার একটি মিষ্টি কথা মনের মধ্যে সারাক্ষণ ঝুমঝুমির মত বাজ্‌ত, তার একটুক্ষণ গল্প করায় আমি সাত্‌রাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, আমার মত ভাগ্যবান্ কে! তখন আমার জীবনে শেলীর যুগ, অ্যালষ্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্ব্বশীর সন্ধানে মন উদাস; জ্যোৎস্না, সে ত বিশ্বসৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর প্রতীক মাত্র, তখন রূপ ও রূপকে ভেদাভেদ নেই, তারি চোখের চাওয়ায় ভুবনউর্ব্বশী জেগে উঠেছে।

অন্ধকার রাতে যখন ডিনেমাইট দিয়ে ট্রেন উড়োতে গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মার্‌তে বোমা হাতে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছি, পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে যখন আসামের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানি-

স্থানের গোলাপকুঞ্জে দ্রাক্ষারস পান করে' যখন লুটিয়ে পড়েছি, আমার জীবনের এই চিরন্তনী চিরতরুণী আমার সাম্‌নে জেগে উঠে' বারবার কি বল্‌তে চেয়েছে! আজও সে আমায় চঞ্চল করে' তুল্‌লে।

কিন্তু, শোন জ্যোৎস্না, আমি যদি কাপুরুষের মত আপনাকে বিনাশ করতে যেতুম, তা হলে' কথা ছিল। লোকে ব্যর্থ প্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজের লোকনিন্দায়, সংসারের দুঃখভারে আত্মহত্যা করতে যায়। কোন্ দুঃখকে সংগ্রামকে আমি জীবনে ডরাই না। কিন্তু, কিছু ভাল লাগে না যে,—এই জীবনভরা শূন্যতায়, এই পৃথিবীর অর্থহীন কর্ম্মচক্রে, বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

এখন বুঝ্‌ছি কেন স্বর্ণ বল্‌ত—দাদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে' একটা দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে' পড়ি', একদিন সকালে উঠে দেখ্‌বে আমি মরে' আছি; যতক্ষণ থিয়েটার করি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজরাণী, কোন রাতে ভিখারিণী, কোন রাতে আয়েসা, কোন রাতে মর্জ্জিনা, কোন রাতে কপালকুণ্ডলা—থিয়েটারের ওই রঙীন সিনে কাল্পনিক জগতে অবাস্তব জীবনে সব ভুলে' থাকি; কিন্তু তার পর, উঃ, দিনের বেলাটা, একটু বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না; তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, তোমাদের সেবা করে' একটু পুণ্যি কর্‌ছি। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্যে আমরা যে ক'জন ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ওই সমাজপরিত্যক্তার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের সেবা করে' সে যে স্বর্গসুখ পেয়েছিল। সে শুধু থিয়েটার করে' জীবিকা অর্জ্জন কর্‌ত। কিন্তু পঙ্কের মধ্যে সে পদ্মটি কি এতদিন নির্ম্মল আছে? কত পুরুষের মত্ত লালসায় সে পদ্মের সব পাপ্‌ড়ি পঙ্কের তলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে।

নারীর ও মোহিনীরূপ আমায় ভুলোয় না। যে রূপে সে গানের সুর, ফুলের পাপ্‌ড়ি, আলেয়ার আলো, স্বর্ণমৃগ হ'য়ে সংসারের মরীচিকায়

ঘোরায়, সে প্রিয়ার রূপ নয়,—নিপীড়িতা মাতা যখন দুঃখের ত্যাগের দুর্গম পথে ডাক দেন, তাঁর বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙ্‌বার জন্যে প্রলয়াগ্নি জ্বেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী মায়ের পায়ে আমি জীবনের বরণমালা দিয়েছি—এই অত্যাচারনিপীড়িতা-দুঃখিনী দেশ-মা, এই যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা আপন সন্তানরক্তকলুষিতা শক্তিমদপীড়িতা পৃথিবী-মা, মাগো, তোমার ওই ব্যথাভরা অশ্রুমাখা মুখ আমাকে ঘরছাড়া করেছে।

কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ছে, একটা ঝড় উঠ্‌ছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটা মত্ত দৈত্যের মত বাতাসে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না নয়, এই ঝঞ্ঝা চাই। এই বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে বজ্রের গর্জ্জনে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান জেগে ওঠে, দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল্‌ করে, স্নায়ুগুলো নাচ্‌তে থাকে, এই গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায় নবজীবনের অভিসারে মৃত্যুর বাঁশি বাজে।

ঘর ছেড়ে' পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম। অন্ধকারের গর্ভ হ'তে ঝোড়ো হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বকের কান্নার মত ছুটে আস্‌ছে। সত্যই একটা কান্নার শব্দ—মা, মা! কে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে—পৃথিবীর বুকের ব্যথায় গুরু গুরু দীর্ঘশ্বাসের মত। চারিদিকে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠ্‌ল, সেই আলোয় দেখ্‌তে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে' আছে, তার কালো কোঁক্‌ড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ে' খোয়ায় লুটিয়ে পড়্‌ছে। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিলুম, শঙ্কিত ক্লান্ত মুখখানি শিশিরসিক্ত শেফালির মত, মুদিত কমলের মত চোখ বোজা, জামার বোতাম কয়েকটা খুলে' গেছে, গোঁ গোঁ করে' মৃদু আর্ত্তনাদ কর্‌ছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধীরে বললুম,—কি হয়েছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে শান্ত হ'য়ে সে নেতিয়ে পড়্‌ল। গর্জ্জমান অন্ধকারটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে' বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে

অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাহীনা মাতার অশ্রুজলের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়্‌তে লাগ্‌ল, বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মাত্‌বার জন্যে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ ফুলের পাঁপ্‌ড়ি আমার বুকে পড়ে' ঘরে ফেরালে!

তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে করে' ঘরে ফির্‌লুম। বিছানাটা পাত্‌তে হ'ল, বাক্‌স হ'তে ফর্‌সা চাদর বের কর্‌তে হ'ল, বালিশটা কি শক্ত, কচি মাথায় লাগ্‌বে। ধূলো-লাগা জামা পা-জামা ঝেড়ে দিলুম, ছাড়ান হ'ল না, ছাড়াতে গেলে হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে, কেঁদে উঠ্‌বে, আর ছাড়িয়ে পরাব কি! কোনমতে খুকীকে শুইয়ে জান্‌লা বন্ধ করে' তার পাশে বিছানার ধারে বস্‌লুম। ছোট সুন্দর নাকে নোলকটা কি সুন্দর, কচি হাতে সরু বালাগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মিষ্টি ছোট পা দুটো, কি মিষ্টি মুখখানা। তার গালে, পা দুটোতে চুমো খেলুম। রিভল্‌ভারটা হেসে উঠ্‌ল।

ঘুমন্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল হ'য়ে নড়ে উঠ্‌ল। নিশ্চয় গরম হচ্ছে। খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগলুম। অস্থির হ'য়ে সে কেঁদে উঠ্‌ছে,—মা, মা! এ ত ভারি মুস্কিল, ছোট মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, ঘুমন্ত অশান্ত খুকীকে মা ভিন্ন কে শান্ত কর্‌তে পারে। ধীরে বুকে তুলে' নিয়ে মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে মুখে আঙ্গুল পুরে দিলুম। আঙ্গুল চুষ্‌তে চুষ্‌তে একটু শান্ত হ'ল। শুইয়ে দিতেই আবার ছট্‌ফট্‌ করছে, কেঁদে উঠ্‌ছে—মা, মা! চোখ খুলে' আস্‌ছে যদি জাগে ত ভয়ঙ্কর কাঁদবে—হয়ত দুধ খেতে চাইবে, আমার ঘরে দুধ কোথায়!

রিভল্‌ভারটা হেসে উঠ্‌ল—কি বন্ধু বড় মুস্কিল! ঘরের কোণে বেহালাটা খুসি হ'য়ে চাইল, বেশ হয়েছে! বেহালাটা তুলে' নিয়ে এলুম

ধূলো জমেছে, তাঁতগুলোয় ছাতা পড়ে' রয়েছে, অভিমানিনী নায়িকার মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বল্লুম, বন্ধু, পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে একটু সাহায্য কর। বেহালায় ঝঙ্কার উঠ্‌তেই খুকীর কান্না থাম্‌তে লাগ্‌ল, গানের সুরে সুরে সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জান্‌লা খুলে' দিলুম। কচিশিশুর আঁখির মত তারারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, খুকীর মুখের দিকে চেয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহস্তীর মত এল; সশব্দে দরজা খুলে' একটা বড় কালো কুকুর ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠ্‌ল, তার পর ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্দনৃত্য। বেহালা রেখে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই এক বয়স্ক যুবক আর বিদ্যুল্লতার মত এক তরুণী এসে ঢুক্‌লেন। তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, চোখের ইসারায় বোঝা যাচ্ছে—বিছানা থেকে অতি ব্যস্ত শঙ্কিতভাবে উঠে এসেছে। তার চোখ দুটি আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, বিছানা হ'তে খুকীকে তুলে' বুকে জড়িয়ে, 'এই যে রেণু', 'এই যে রেণু' বলে' আনন্দে চুমো খেতে আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। যুবকটি একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতস্বরে বল্‌লে, —ক্ষমা কর্‌বেন!—

আর একটু এগিয়ে আসাতে আলোটা তার মুখে পড়্‌ল, আমি নিমেষে চিন্‌লুম, আনন্দের সঙ্গে বলে' উঠ্‌লুম—আরে তুমি, সুরেশ! কলেজে সুরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপমার বস্তু ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক্ হ'য়ে একটু ব্যথার সঙ্গে বল্‌লে,—তুমি! কি চেহারা তোমার হয়েছে! কলেজে তোমার মত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে Asoke's ghost! এটি ভাই আমার মেয়ে,

কোথায় পেলে? হেসে বল্লুম—রাত দুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে সুরেশ বল্‌লে, ওর ভাই ও রকম ঘুমন্ত উঠে বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাটা খোলা ছিল,—উনি হচ্ছেন আমার শ্যালিকা।

শিরীষফুলের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা তরুণীর দিকে চাইলুম। খুকীকে কোলে করে' আমার অগোছান ঘর আর বই-খাতা-গাদা-করা টেবিলটি দেখ্‌ছিল। সুরেশ ধীরে বল্‌লে,—তুমি এত কাছে আছ, জান্‌তুম না। আমি সাম্‌নের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি। এটা বুঝি মেস, না হলে' এত অপরিষ্কার,—কি সৌখীন তুমি ছিলে!

তরুণীর মুখটী একটু করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো ঘাঁটছে, এই অগোছাল ঘরটা নিমিষে গুছিয়ে দিতে পার্‌লে সে যেন কি আনন্দ পায়। ধীরে সে বল্‌লে, —দিদি হয় ত বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

সুরেশ বল্‌লে,—হাঁ ভাই, রেণুর মা, বুঝ্‌তেই পার্‌ছ, কি রকম ছট্‌ফট করছে। এখন যাই, কাল সকালে আস্‌ব'খন। অতসী, বই ঘাটতে আরম্ভ করেছ ত! শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এস এখন. কাল আলাপ হবে'খন।

দরজা পর্য্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার সময় অতসী কিছু বল্‌লে না, শুধু রঙীন চোখে চেয়ে ধীরে একটা নমস্কার কর্‌লে। কুকুরটাও আমার দিকে চেয়ে একবার ল্যাজ নাড়্‌লে।

চুপ করে' একা ঘরে বসে' আছি। চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলে' পড়েছে, পূর্ব্বাকাশের তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ কর্‌ছে। রিভল্‌ভারটা কোথায় রাখলুম, মনে পড়্‌ছে না। ইজিচেয়ারে বসে' নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালার মানভঞ্জন কর্‌তে বস্‌লুম।

পৃথিবী-মা গো, এই দুরন্ত ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে তুমি বুঝি বড় ভালবাস, তাই দুটো সুকোমল সুন্দর বাহু দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বার জন্যে এ ঝড়ের রাতে এম্‌নি ছোট-মা হ'য়ে এলে।

(২)

এই ছোট খুকীটি তার দুখানি কচি হাত দিয়ে আমায় বাঁধ্‌লে দেখ্‌ছি। তাই সকাল-বেলা সুরেশ যখন এসে বল্‌লে—চল, শুধু তার ফুলের মত কচি মুখখানি দেখ্‌বার জন্যে ছুটে' চল্‌লুম।

সুরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দর বাড়ীখানি। আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তার ঘরে নিয়ে গেল। অতসী অভ্যর্থনা করে' বসালে, কুকুরটাও একবার ল্যাজ নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সুরেশ বাইরে মক্কেলদের কাছে চলে' গেলে অতসী মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে,—কাল আপনার রিভল্‌ভারটা নিয়ে এসেছি।

আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লুম,—খুঁজে পাচ্ছিলুম না বটে। আর চিঠিটা?

চোখে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে সে বল্‌লে,—সেটাও। ভয় নেই, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিস্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। মৃদু হেসে সে বল্‌লে,—রিভল্‌ভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন কর্‌তে যাবেন না কিন্তু—

এ যেন তার হুকুম।

সুরেশের মা রেণুর হাত ধরে' ঘরে এলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যস্নিগ্ধ স্নেহকল্যাণমণ্ডিত মূর্ত্তি, কাঁচাসোনার মত দেহের আভা সাদা থান ফুটে' বেরুচ্ছে, তাঁকে দেখ্‌লেই পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াতে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—কি রে তুই এত কাছে আছিস, এতদিন দেখা হয়নি!

হেসে বল্‌লুম,—মার দেখা পেতে অনেক পুণ্যির দরকার যে মা।

স্নেহ-বিকশিত-নয়নে চেয়ে বল্‌লেন,—কি রোগা হ'য়ে গেছিস্‌! মেসে আছিস বুঝি!

অতসী ফোড়ং দিলে,—হ্যাঁ মা, যেমন নোংরা তেম্‌নি অন্ধকার।

মা বল্‌লেন,—যা চেহারা হয়েছে! মেস ছেড়ে আয়, আমাদের এখানে থাক্‌বি।

বল্‌লুম—সে ভাগ্যি কি আছে মা যে তোমার প্রসাদ পাব! এ লক্ষ্মীছাড়াদের ও-স্বভাবটা খুব আছে, যেখানেই বলো মা নিজের ঘর করে' জমিয়ে বস্‌তে পারি।

রেণু তার দিদিমার পাশে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে বার বার দেখ্‌ছিল। তার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বল্‌লুম,—এ মা-টি যে কিছু বলে না।

মা হেসে বল্‌লেন,—ওরে রেণু, চিন্‌তে পারছিস্‌ না, ও যে তোকে কাল চুরি করে' নিয়ে গেছ্‌ল।

রেণু একটু ভীত হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। মা হেসে উঠে' বল্‌লেন,—না রে না, ও তোর কাকা, প্রণাম কর। আজ রেণুর জন্মদিন।

রেণু তাড়াতাড়ি প্রণামটা সেরে অতসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বল্‌লুম,—না মা, কাকা নয়, আমার এখন মায়ের দর্‌কার, আমার নাম অশোক, একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝ্‌লে মা?

মা চলে' গেলেন। রেণু অতসীর কানের কাছে গিয়ে কি বল্‌ছে। আমি বল্‌লুম,—কি বল্‌ছে?

অতসী হেসে বল্‌লে,—বল্‌ছে, চুলগুলো কি বিচ্ছিরি হ'য়ে রয়েছে! ওর কি কেউ নেই যে চুল আঁচ্‌ড়ে দেবে?

রেণুর দিকে চেয়ে বল্‌লুম,—আমার ত আর মা নেই!

বা, আমি ত হলুম,—বলেই সে রাঙা মুখখানি টেবিলের আড়ালে লুকোল। একটু পরে এক ভাঙা চিরুণী এনে আমার চুলের সংস্কার কর্‌তে বস্‌ল।

কাল রাতে জীবনটা একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল, আজ এই অতসীর-হাতে-গোছান ঘরে বসে' ভাব্‌ছি, রাতারাতি পথের ভিখারী কেমন করে' লাখপতি হ'য়ে ওঠে। আমাকে একেবারে দীন করে' তার পর এ কি ঐশ্বর্য্য দেওয়া!

যে মাকে আবার পেলুম, এমন মা কার আছে! তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লে মনের সব তাপ জুড়িয়ে যায়। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা উনি, ছোট বেলা হ'তে পিতৃহীন সুরেশকে কি স্নেহময় শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ করেছেন। সুরেশ যখন ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে কর্‌তে চাইলে, বাড়ীর সবাই কি আপত্তি কর্‌লে, কিন্তু ইনি নিজে গিয়ে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে' এলেন। এ মায়ের আশীর্ব্বাদের প্রসাদে এক দিনেই যেন সেরে গেছি।

আর এই রেণু-মাটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই চিরআনন্দময় সরল শিশু-আমি আমার মধ্যে মরেনি দেখ্‌ছি, আর-এক শিশুর কলহাস্যে সে জেগে উঠ্‌ল। প্রতি বংশের আশা-স্বপ্ন যতবার বিফল হচ্ছে, সৃষ্টি আবার নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিয়ে সে স্বপ্নের সাধনা সুরু কর্‌ছে!—রেণু সৃষ্টির চিরনবীন বাণী আমার জীবনে নিয়ে এল।

আর অতসী! এই মিষ্টি মেয়েটি যেন কত দিনের বন্ধু। সারা দুপুর তার লাইব্রেরীটা খুব উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখিয়ে কি করুণ মধুর হেসে চাইলে। কত বই সে পড়েছে, সে কত ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কিছুই সে কর্‌তে পার্‌ছে না—দেশের কাজ কর্‌তে এত তার ইচ্ছে করে। কতকগুলো রাজনীতি-সমাজনীতির বই দেখিয়ে সে বল্‌লে,—দেখুন এসব ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু যখন দেখি এরা যা বল্‌ছে তার সঙ্গে

আমার মনের কথায় মিল হ'য়ে যায়, এত আনন্দ হয়। কিন্তু শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে' কি হবে বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে।

বল্লুম,—কেন, তোমরা ত ব্রাহ্ম, তোমাদের কত স্বাধীনতা।

সে বল্লে,—কি আর স্বাধীনতা আছে, এই যা বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছি, আর জোর করে' এখনও বিয়ে দেয় নি।

হেসে বল্লুম,—আমার মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে ঘরকন্না করবার উপদেশ দেবে না। তবে কি জান, শান্তি যদি চাও, তবে ওই ঘরকন্নাতেই পাবে।

না, আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে' অনুভব কর্‌তে চাই,—কথাগুলো বলে'ই সে একটু লজ্জিত হ'য়ে চুপ কর্‌ল।

আমার জীবনের এক নিগূঢ় গভীর বেদনার পথে তার সঙ্গে জানা হ'ল বলে' সে একদিনেই আমার পরম বন্ধু হ'য়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় সে বল্‌ছিল,—চুপচাপ বসে' ভাব্‌বেন না বেশী। আপনার মনটা একটু অসুস্থ আছে, শরীরটা সারিয়ে নিন ভাল করে'। আপনারা নিরাশ হ'লে কি হবে?

বল্লুম,—তুমি কি ভাব আমাদের দিয়ে দেশের কোন মঙ্গল হবে?

সে বল্লে,—আমি কি জানি বলুন, তবে আমি যদি ছেলে হ'য়ে জন্মাতুম, আমিও অ্যানার্কিষ্ট্ হতুম। আপনার বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে' থাক্‌লেই মন খারাপ হবে।

মেয়েরা চিরকাল আমার কাছে রহস্য, তাদের বুঝ্‌তে চাইনি, শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাজিয়ে চলেছি।

(৩)

ধীরে ধীরে মনটা দেখ্‌ছি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে, অবসাদ কেটে যাচ্ছে,

নব জীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজা করে' তোল্‌বার জন্যে অতসীর চেষ্টার অন্ত নেই।

ছোট ঘরের গারদে পোরা এই বাঙালীর মেয়েটি। কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর কত ঘরের হাসিকান্না, কত জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের সুখদুঃখ জড়িয়ে আছে। তার জন্যে সুরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলো নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, আর বই কেনার ত শেষ নেই। সুরেশ সেদিন বল্‌লে,—দেখ, শ্যালিকার কি expensive hobby! ওর কাছে অতসীর বই-পড়াটা একটা সখ মাত্র। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ।

রোজ সকালে অতসী আমাকে ধরে' তার খবরের কাগজের রাজত্বে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুগুরু ধ্বনি, পৃথিবী-মার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ শব্দ যেন শুনতে পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া,—কোথায় বোমা ফাটল, কার কারাদণ্ড হ'ল, কোন কলের আগুনে কত কুলি মর্‌ল, ইত্যাদি। তার পর বিদেশের, আয়র্ল্যাণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্তমন্ত্রণা হচ্ছে, বল্‌কানে প্রশান্তির রূপ কি দাঁড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিদ্রোহীর বিচার, প্রতি বিষয়ে তার মন সজাগ, উৎসুক।

দুপুরে কোন কোন দিন দূরদেশের ভ্রমণকাহিনী বা জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের ইতিহাস নিয়ে বসে; বেদুইনরা কি ভাবে জীবন চালায়, ফরাসী-বিপ্লবের রাতে কি হয়েছিল, ল্যাপ্‌লাণ্ডের জীবনধারা কি রকম, সাহারার মরুভূমে কি সভ্যতা চাপা পড়েছে—সব

পড়ে' শুনিয়ে আলোচনা করে' আমার এ মনকে পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসধারার সঙ্গে যুক্ত করে' দিতে চায়।

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়্‌তে মন লাগ্‌ত না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে,—হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি সকালে আয়ার্ল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে কাগজে কি লেখা থাক্‌বে, অমুক বিচারের রায় কি বেরুবে,—বৃহৎ মানবসমাজের জীবনস্পন্দন আপন নাড়ীতে অনুভব করি।

কিন্তু মনটা এতে ঠিক সারে নি, সেরেছে অতসীর গানের সুরে। সন্ধ্যে বেলায় সে রেণুকে নিয়ে গান গাইতে বসে, আমাকেও সেই ভাঙা বেহালায় নতুন তাঁত লাগিয়ে বাজাতে বস্‌তে হয়। গানের সুর এক দিন আলো-বাতাসের মত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, শান্তিহারা জীবনটা আবার সুরে বাঁধ্‌ছি।

আশ্চর্য্য অতসীর গলাটা! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত্র হ'তে সুর ঝরে' পড়্‌ছে, গান যখন থেমে যায়, নৃত্যময়ী সুরপরীদের শিঞ্জিনীধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে' ঘর ভরে' কাঁপে, ঘুরে' বেড়ায়। তার সন্ধ্যায় গাওয়া গানের সুর এখনও কানে বাজ্‌ছে,—

"গানের সুরের ভিতর যখন দেখি ভুবনখানি,
আমি তখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি।"

পৃথিবীকে—জীবনকে গানের সুরের ভিতর দিয়ে দেখা, এই পরম দৃষ্টি সে আমায় দিলে।

আজ বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, দেখে সে বল্‌লে,—কি হ'ল আপনার?

বেহালায় এক পুরানো সুর বাজাতে বাজাতে মনে হ'ল, যেন আমি আমার সতেরো বছরের আমিতে ফিরে' এসেছি, জ্যোৎস্না আমার

সাম্‌নে বসে' গান গাইছে। এম্‌নি এক শুক্লা একাদশীর হারান সন্ধ্যা চোখের উপর চম্‌কে উঠ্‌ল।

মনের সব অন্ধকার বন্ধ ঘরগুলো খুলে' যাচ্ছে, গানের সুরের আলোয় ভরে' উঠ্‌ছে। রাতে এক ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে সে যে গান গাইছিল, সেই মালশ্রী রাগিণী তারায় তারায় কেঁপে বাজ্‌ছে—

"আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্‌ব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।"

(৪)

অতসী আমার চারিদিকে যেন একটা মায়ার জাল রচনা কর্‌ছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয়, কথাগুলো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, শুধু সুরের মত বাজ্‌ছে, তার সুন্দর ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গীটা এক শিল্পকার্য্যের মত উপভোগ করি, রহস্যময় মধুর চোখের দিকে চেয়ে থাকি। কাল যখন সে সন্ধ্যার অন্ধকারে জান্‌লায় সুদূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমার মনে হ'ল, সে যেন রূপ নয়—একটা রূপক, চিরন্তনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতার মূর্ত্তি, তারার আলোয় চিররাত্রি চেয়ে কার প্রতীক্ষা কর্‌ছে।

কিন্তু অতসী মায়ামন্ত্র পড়ে' যে সৌন্দর্য্য-আনন্দের রূপজাল দিয়ে আমায় ঘির্‌ছিল তা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে' ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রেণুর সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছি, রেণু বল্‌লে—এই টব্‌টায় বেশী জল দাও না, আমি আর পার্‌ছি না।

বল্‌লুম, কৈ টবে গাছ কৈ ?

সে অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে,—বা, তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে, সেটা ওতে ত পুঁতে রেখেছি, দেখ্‌বে পরশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে।

মা গল্প করতে ধরে' নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় অতসীর কথা উঠল। মা বললেন,—দেখ, ওর মা মরার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন, বললেন—দিদি, সরসীকে তোমার হাতে দিয়েছি, অতসীকে তোমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরছি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই দেবে জানি। তা দেখ, এতদিন ও বিয়ের কথা বললে হাড়ে জ্বলে' উঠত, এখন তোর উপর একটু টান হয়েছে দেখ্‌ছি। তুই কি বলিস বল্?

হেসে বললুম,—একটু টান হয়েছে? আমার মত লক্ষ্মীছাড়া!

মা বললেন,—চুপ কর্ হতভাগা। সুরেশ বলছে, তোরা দু'জনে মিলে একটা কাগজ বের কর্, ও তার টাকা দেবে।

ধীরে বললুম,—মা, তুমি ত জান সব, কেন এ কথা তুললে?

বুঝলুম, মার মনে বেদনা লাগ্‌ল। ধীরে তাঁর হাতখানি ধরে' আদর করতে লাগ্‌লুম। তার পর জানি না কেমন করে' জ্যোৎস্নার কথা উঠ্‌ল, আমি দেড় বছর বাংলায় নেই, তাদের কথা কিছুই জানি না। মা বললেন, জ্যোৎস্নার স্বামী গেল বছর মারা গেছে, জমিদারের ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অসুখ করলে, বুকটাও খারাপ ছিল।

আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লুম—সে কেমন আছে মা?

মা ধীরে বললেন,—তোর কথা ভেবে তাকে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, যখন এসে দাঁড়াল, বুকটা ফেটে গেল রে! একটু কাঁদলে না, শুধু মুখটা বুকে গুঁজে' পড়ে' রইল।

তার পর মা যে কত কি বলে' যেতে লাগ্‌লেন কিছুই আমার কানে এল না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত মার কাছে জ্যোৎস্নার সব কথা শুনতে লাগ্‌লুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোৎস্না—বিয়ের রাতে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মূর্ত্তিটি চোখে আঁকা রয়েছে। এখন সে বৃহৎ জমি-

দার-পরিবারের কর্ত্রী, এখনও সে তেম্‌নি স্নিগ্ধ মধুর দিব্যশ্রী। মার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সেই শুভ্রবসনপরিহিতা কল্যাণী লক্ষ্মীর ছবিটি ভাব্‌ছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন ম্যাডোনার মত হয়েছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তার ছেলেটি কেমন হয়েছে মা ?

মা বল্‌লেন,—কি সুন্দর হয়েছে রে, কি শান্ত, নম্র, আমায় প্রণাম করে' এমন সুন্দরমুখে দাঁড়াল !

বুকে কি একটা বেদনা হচ্ছে, উঃ, সেই মাতালটা !

ভাব্‌চি জীবনটা কি ? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি কি করাতে চায়। ধরো, এই সুরেশ, তার হাইকোর্ট, মক্কেল, মোটর, স্ত্রীকন্যা নিয়ে বেশ সুখে আছে, কিন্তু আমি ত এম্‌নি করে' শান্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারি না।

আমার হাতে তোমার বাঁশিকে দিলে না প্রভু, তোমার বজ্রকে দিলে, আমার কপালে তোমার দুঃখের অগ্নিতিলক জ্বালিয়ে দিলে ! ইচ্ছে কর্‌ছে, একটা ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যান্ত ছুটে' যাই, অগ্নিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ করে', রাজার মুকুট খসিয়ে, ধনীর প্রাসাদ জ্বালিয়ে, শক্তির দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র চুর্‌মার করে'।

(৫)

অতসী ধরে' ফেলেছে, আবার আমার মনটা বিকল হয়েছে। দুপুরে রেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে পার্‌ছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে' চলে' গেল। এবার বুঝ্‌ছি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এসেছে।

অতসী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে' নিয়ে গেল, বল্‌লে—আবার কি ভাব্‌চ ? কাল সারারাত ঘুমোওনি—ছাদে ঘুরেচ।

বুঝ্‌লুম আজ সহজে সে ছাড়্‌বে না। ভালবাসার দুঃখ তাকে আর দিতে চাই না, খোলাখুলি সব বুঝিয়ে দিই।

হেসে বল্‌লুম,—আমি হচ্ছি একটা অ্যানার্কিষ্ট্‌, মৃত্যুর দোসর, আমার জন্য ভাব কেন?

কি করুণমুখে সে আমার দিকে চাইলে! কত রূপে নারীকে পেলুম,—কেউ বুকে আগুন জ্বালায়, কেউ চন্দনের প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলো হ'য়ে দিশাহারা করে' ঘোরায়, কেউ স্নিগ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা রাত প্রতীক্ষা করে।

ধীরে বল্‌লুম,—দেখ, তোমার কথা দিয়ে গান দিয়ে আমার এ ভাঙা মন তুমি সারিয়ে তুলেছ, তোমার ঋণ কোন দিন শুধ্‌তে পার্‌ব না বন্ধু, কিন্তু এর উপর কোন লোভ কোরো না।

তার বুকের রক্ত রিমঝিম্‌ কর্‌ছে, চোখ জ্বল্‌জ্বলে হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে,—আমাকে শুধু তোমার বন্ধুর কাজই কর্‌তে দাও,—তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাকে ব্যর্থ কোরো না।

ধীরে বল্‌লুম,—সেই শক্তিকেই সার্থক কর্‌বার জন্যে আমায় চলে' যেতে হবে।

সে ভাঙা-গলায় বল্‌লে,—আবার তুমি ওই পথে যাবে?

বল্‌লুম,—ঠিক ওপথে নয়। দেখ, তুমি ঘরে বসে' কাগজ পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা; আমি তা পারি না, আমার গা জ্বলে, ইচ্ছে করে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে' ধরিগে। রিভল্‌ভার আমি ফেরৎ চাইছি না, এবার প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়ে অবিচারের মরণোৎসব হবে। তুমি কি ভাব, এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে ভেজান ধনীর স্বর্ণ স্তূপীকৃত হচ্ছে, শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রশক্তির শাসন-

পেয়ালা অত্যাচারের বিষে ভরে' উঠ্‌ছে। এই রাজ্য নিয়ে রাজনীতি-বিদ্‌দের জুয়াখেলা, মানবাত্মা নিয়ে পুরোহিতদের ধাপ্পাবাজি, এই প্রবল জাতির নিষ্ঠুর লোভ, শক্তির ক্রুর অত্যাচার চিরকাল টিক্‌বে? এই যন্ত্রশক্তি-অধিষ্ঠিত বণিক্‌-সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, আমরা সেই ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তাঁর বজ্র দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনাকধ্বনি করে' সবাইকে জাগাতে হবে।

অতসীর মুখ অগ্নিশিখার মত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, চোখে স্বপ্নের গোলাপী আভা জড়ান, চুল ফুলে' উঠ্‌ল', বুক দুল্‌তে লাগ্‌ল।

দীপ্তকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লুম,—

"হায়! সে কি সুখ এই গৃহ ছাড়ি,
হাতে লয়ে' জয়তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে বসিয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

অতসী বলে উঠ্‌ল,—আর আমরা!

বল্‌লুম,—বাংলারও সেদিন আস্‌বে, তোমাদের পর্দ্দা ছিঁড়ে' যাবে, গারদ ভেঙে যাবে, অবগুণ্ঠন খসে' যাবে। আজ বাংলার এ কোণে যে প্রাণের আগুন জ্বলে, নিভে যাচ্ছে দেখ্‌ছ, ভাব্‌ছ ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে পূরে' সে প্রাণকে মার্‌বে?—আজ শুধু পূর্ব্বসূচনা। ভারতের এ যুগের গুরুগোবিন্দ কোথায় কৃচ্ছ তপস্যা কর্‌ছেন জানি না, কিন্তু তিনি দুঃখের সাধনা আরম্ভ করেছেন—তিনি আস্‌ছেন, তিনি আস্‌ছেন, তাঁর আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন কর্‌তে হবে।

(৬)

আজ নিশীথরাতে আবার ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। ওই অন্ধকার শূন্য হ'তে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার আহ্বান আবার এল। ভাঙা দেহমন তসারান হ'ল, শান্তিনীড় ছেড়ে' আবার দুঃখের পথে বেরুতে হবে। তরুণী বন্ধুর করুণ চোখের চাওয়া কিছুতেই ভুলতে পার্‌ছি না।

পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে, এই আকাশ-জোড়া হাহাকারে—গাছপালার করুণ মর্ম্মরে—বুকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি। আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারব না। মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা কর্‌বে! এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হ'য়ে কচি হাতের বাঁধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌লে, আর এক রাতে এ কি প্রলয়ঙ্করীরূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া কর্‌ছ!

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়্‌ছে। এম্‌নি এক ঝড়ের রাতে বহু পুরাতন বট-গাছের তলায় ভাঙা মন্দিরে কালীমূর্ত্তির সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এ জীবন মার কাজে উৎসর্গ কর্‌ব। গৃহ ছাড়্‌লুম, সব স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন কর্‌লুম, অর্থ মান সুখলোভ ত্যাগ কর্‌লুম। আছে শুধু শাণিত খড়্গ, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের স্রোত। এই ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখ্‌ছি, নিবিড়-তিমির-ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, রক্তাক্ত খড়্গের আভা নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎসবের অট্টহাস্যের স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুতের চিকিমিকিতে অতসীর চোখের চাউনি জেগে উঠ্‌ল।

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জান্‌লাগুলো সশব্দে বার বার খুল্‌ছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্রেরীতে ঢুক্‌লুম, অন্ধকারে আলোর সুইচ্‌টা খুঁজ্‌তে গিয়ে কার গায়ে হাত পড়্‌ল,—শাড়ীর খস্‌খসে—চুড়ির

টুং-টাং-এ অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌ল, কেশের মদির গন্ধ, বিদ্যুতের মত স্পর্শ! জান্‌লা দিয়ে বিদ্যুতের আলো চম্‌কে গেল। দেখ্‌লুম অতসীর অনির্ব্বচনীয় মুখ।

তুমি ?

হাঁ আমি।

সমস্ত অন্ধকার তার গলার সুরে বেজে আমায় ঘিরে' ধর্‌লে।

দু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম,—আজ ঝড়-জলে ওই বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আসে না। কতক্ষণ দুজনে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বল্‌লুম,—ওই যে ঈশান কোণে কালো মেঘে বিদ্যুৎ জ্বলে' উঠ্‌ছে,—তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি পাচ্ছি,—পৃথিবী জুড়ে' বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে, নটরাজ তাঁর ধ্বংসের লীলা সুরু কর্‌লেন বলে'। এক-এক দেশে তিনি তাঁর পা ছুঁইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ছে—একবার রুষিয়ায়, একবার চীনে, একবার আয়র্ল্যাণ্ডে, একবার তুরস্কে,—রুদ্রের চরণ-চিহ্ন দেশে দেশে পড়্‌ছে ; যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যুগ্র হ'য়ে উঠেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ রোষ জমে' উঠেছে,—ওই ইউরোপের অন্তস্তল ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত যুদ্ধাগ্নি জ্বলে' উঠ্‌ছে, ক্ষুব্ধ জনসংঘের বিদ্রোহের ভূমিকম্পে বর্ত্তমান বণিক-সভ্যতা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজ ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজ্‌ছে।

আকুল ধারায় বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ হ'ল। দুজনে বারান্দার কোণে সরে' পাশাপাশি দাঁড়ালুম। আমার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্‌লে, তুমি কি সত্যি যাবে ?

শুধু তার মুখের দিকে চাইলুম।

—তোমাকে আমি বাধা দেব না, আমাকে যখন দর্‌কার হবে ডাক দিও।

আমাদের ঘিরে ঝড়জল উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল। মাতার অশ্রুজল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারের মাঝে প্রলয়-পথিককে চলে যেতে হবে।

অতসীর কথা

যেই ঝড়ের রাতে বন্ধু যে চলে' গেল তার পর কত বছর কেটে গেল। প্রতিবছর একবার করে' তার খবর পেতুম, রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীর যে কোণেই সে থাকুক তার বিদ্রোহী ছেলের একটা উপহার এসে পৌঁছত। কোন বৎসর নিউইয়র্ক্ থেকে, কোন বার প্যারিস্ থেকে, কোন বার বাগ্‌দাদ থেকে। বর্ত্তমান বণিক-সভ্যতা ও রাষ্ট্র-তন্ত্রের ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবীজোড়া বিপ্লবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ দিয়েছে। বন্ধু যখন ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত ঘুরে' বেড়িয়েছে, আমি স্কুলে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে' কাগজ পড়েছি, নভেল পড়েছি, রান্না করেছি, ঘর ঝাঁট দিয়েছি, আর প্রতিদিন সেই ঝড়ের-রাতে-দেখা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ভেবেছি, সেই মন-ভোলান ঘর-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপ্ত মুখ।

তার পর ভারতের মহা দিন এল। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অন্ধপ্রথা ও প্রভুত্ব-পীড়িত ভারতের ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম পথে আহ্বান কর্‌লেন, এ নব ভগীরথ স্বাধীনতার শঙ্খ বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার অমৃতলোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন কর্‌লেন—মৃতমূক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠ্‌ল!

রেণুর জন্মদিন। তাকে ধরে' চর্‌কার সুতো কাটাতে বসেছি।

সহসা পেছনে পায়ের শব্দে চম্‌কে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়ালুম, অশোক আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চর্‌কা। কি সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, কাঁচাপাকা-দাড়িভরা মুখখানি যেন যিশুখৃষ্টের মত।

আমার হাত জড়িয়ে ধরে' সে বল্‌লে,—ফিরে এলুম, আবার নূতন খেলায় মাত্‌তে।

বল্‌লুম—কি আশ্চর্য্য! তোমার কথাই ভাব্‌ছিলুম, আজ রেণুর জন্মদিন, এখনও তোমার উপহার এল না।

এই যে, বলে' সে চর্‌কাটা রেণুকে দিলে। রেণু অতি সলজ্জভাবে তাকে প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াল।

আবার মায়ের ডাকে ফিরে' এলুম,—বলে' সে রেণুকে আদর কর্‌লে।

বলে' গিয়েছিলুম, ভারতের দুর্দ্দিন দূর কর্‌বার জন্যে বীর সাধক আস্‌বেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু মা কৈ?

চোখে অশ্রুর বান ডেকে এল, কোনমতে বল্‌লুম,—গেল বছর তিনি স্বর্গে গেছেন।

বন্ধু সাম্‌নের চেয়ারে বসে' পড়্‌ল, ভাঙা গলায় বল্‌লে,—আমায় কিছু বলে' গেছেন।

আমার সমস্ত মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, তাঁর মৃত্যুদিনের কথাগুলো কানে বাজ্‌তে লাগ্‌ল; তিনি বলেছিলেন, সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা যদি আবার ফিরে আসে মা, বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করেছি, তার হাতে তোকে দিয়ে যেতে পার্‌লে আমি খুব আনন্দে মর্‌তুম। বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বল্‌লুম,—তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করে' গেছেন।

অস্ফুটস্বরে মাথা নত করে' সে বল্‌লে,—বুঝেচি।

দাদা এলে অশোক বল্‌লে,—ওহে, মনে আছে বলেছিলে, যদি কাগজ বের কর্‌তে চাও ত টাকা দেব, এখন সে কথাটা রাখ দেখি।

দাদা রাজী হলেন।

তার পরের দিনগুলো লেখায় পড়ায় কাজে কি উৎসাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগ্‌ল। সভা করে' সমিতি গড়ে' প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে' দিনরাত গান্ধীর বাণী প্রচারে অশোক উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল!

একদিন বিকেলে দাদা শুক্‌নো মুখে এসে বল্‌লেন,—ওরে, অশোককে পুলিসে ধরে' নিয়ে গেছে, কোথায় বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু চোখে জল এল। দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—এই বুঝি বাঙালীর বীর মেয়ে!

শুধু বল্লুম, ওর কি ভাঙা শরীর জান ত।

দাদা ধীরে বল্‌লেন,—দেখ, কাল থেকে আমি আর কোর্টে যাব না।

উৎসাহের সহিত বল্লুম,—সত্যি, যাবে না!

দাদা হেসে বল্‌লেন,—হ্যাঁরে, আর ভাল লাগে না।

দাদার পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে' দাঁড়ালুম।

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল, তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্দরপরা সেই রোগা লম্বা শরীরে কি তেজ। সোণার আভার মত দেহের রং-এ অন্তরাত্মার দীপ্যমান সত্য পুরুষটির রূপ দেখা যাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ তপঃক্লিষ্ট মুখে কি অপরূপ মহিমা জড়ান, অহর্নিশি দেখে'ও চোখ তৃপ্ত হয় না।

অশোকের সঙ্গে জেল থেকে একটি তরুণ সুন্দর যুবক এল। তার স্নিগ্ধ তেজোমণ্ডিত মুখখানির দিকে চেয়ে বল্লুম,—এ কে?

অশোক তার পিঠে চাপ্‌ড়ে বল্‌লে,—দেখ, জেলে গিয়েছিলুম, তবেই ত এটিকে পেলুম, এ হচ্ছে জ্যোৎস্নার ছেলে, আমরা এক জেলেই ছিলুম।

বল্‌লুম,—আহা গেল বছর ত ও মা হারিয়েছে।

কি করুণ হেসে বন্ধু বল্‌লে,—হাঁ, তাই ত মার কাজে এমন করে' লেগেছে। ওরে রেণু, সুতো-কাটা বন্ধ করে' পালাচ্ছিস কেন, আয়। এটি আমার ছোট-মা। অতু, জান, এর নামও অশোক।

সেই ভাঙা শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগ্‌ল। দেহটা প্রতিদিন খুব-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হ'তে লাগ্‌ল ; স্নান করা, খাওয়া, ঘুমান, কিছুরই হুঁশ থাকে না ; কোন বারণ মানে না। আমি যখন ঠেকাতে পার্‌তুম না, রেণুকে পাঠাতুম। রেণু জোর কর্‌লে' তবে লেখা বন্ধ হ'ত, ঘুমোতে যেত।

একটু শরীর সার্‌তেই অশোক আবার কল্‌কাতা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়্‌ল। রেণুও তাকে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত অন্ধ মুর্খ ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই আমার কাজ।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে টেলিগ্রাম এল,—অশোকের ভয়ানক অসুখ। সেই রাতেই সবাই কল্‌কাতা ছেড়ে বেরলুম। গিয়ে দেখি সহর থেকে অনেক দূরে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন গ্রামে পচা পুকুরের ধারে এক কুঁড়ে-ঘরে অশোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে' রয়েছে। নীলার মত স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বল্‌লে,—এসেছ ভাই, ভাব্‌ছিলুম আর বুঝি দেখা হবে না।

দাদাকে বল্‌লুম,—এ কি কাণ্ড দাদা! এত অসুখ, ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ে'!

দাদা বল্‌লেন,—এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে, অসুখ শুনে' ওর দাদা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সহরে নিয়ে যেতে, অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখ্‌তেন না, কোন বন্দোবস্ত করে' দিতেন, কিন্তু অশোক কিছুতেই গেল না।

রেণুর অনেক কান্নাকাটির পর অশোক পাশেই এক পাকা-বাড়ীতে যেতে রাজী হ'ল।

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা করে' ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ দিন-রাতের প্রতিক্ষণ আমার মনে গাঁথা রয়েছে। জীবনপ্রদীপ নিভ্‌বার আগে কি জ্বল্‌জ্বলে হ'য়ে উঠ্‌ল! সে রাতে বন্ধু অতি শান্ত হ'য়ে শুয়ে ছিল, জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমের মুকুলের গন্ধভরা হাওয়া আস্‌ছে, কচিপাতা-ভরা গাছ থেকে একটা বউ-কথা-কও পাখী মাঝে মাঝে ডেকে উঠ্‌ছে, নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম, শুধু আমরা দুজন জেগে আছি। ধীরে সে বল্‌লে—তুমি শুতে যাও, আমি ত ভালই আছি।

—তুমি একটু ঘুমোও না।

—ঘুম কি চোখে আস্‌বে?

—আমারও ত আস্‌বে না।

—রেণু ঘুমোতে গেছে?

—হাঁ, ওতে আর অশোকে এতক্ষণ ঝগ্‌ড়া কর্‌ছিল, কে রাত জাগ্‌বে। আমি দুজনকেই জোর করে' ঘুমোতে পাঠিয়েছি।

—দেখ, ওদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে দিও।

—হাঁ, সে আমি ভেবেছি, তোমাকে সেবা করার মধ্যে ওদের মিলন হ'য়ে গেছে।

—জান্‌লাটা খুলে দাও ত। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! এম্‌নি এক জ্যোৎস্না-রাতে আমি মর্‌তে গিয়েছিলুম! সে মৃত্যু থেকে কে বাঁচিয়েছিল! জীবন কি পরমাশ্চর্য্য রহস্য, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝ্‌লুম না, শুধু জান্‌লুম কোন আনন্দময় বিশ্বশক্তি আমাকে সৃষ্টি করে' তার কাজ করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজটা এতদিন পরে খুঁজে পেলুম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে পীড়িতদের সেবা করে' যে কি আনন্দ পেয়েছি, তার তুলনা নেই। দেখ, মহাপুরুষদের সেই কথাই সত্যি—শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে,—লোভ দিয়ে নয়, ত্যাগ দিয়ে,—জীবনকে ধ্বংস করে' নয়, আপন জীবন উৎসর্গ করে' আত্মার আনন্দ খুঁজে' পাওয়া যায়।

পাখার বাতাস কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লুম,—একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর না।

ভোরের শুকতারার মত কোন্ জাগরণের আলো তার চোখে জ্বলে উঠ্‌ল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে সে বল্‌লে,—না, আজ আমায় বল্‌তে দাও—বিশ্বের সৃষ্টির কাজে ব্রহ্মার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি, রুদ্রের বজ্র হ'য়ে ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেল্‌লুম, গড়ার খেলাটা আর খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীতে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আনন্দের সৃষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম, পৃথিবীর কোন্ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল জান, পৃথিবীতে এক ধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্ম, এক জাতি—মানব জাতি, এক দেশ—এই পৃথিবী-মা। কোন্ মহামিলনের দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জার্ম্মান, কাফ্রী, জুলু, বাঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেল্‌ছে, যে লোহা পিটুছে, যে লিখ্‌ছে, যে জাহাজ চালাচ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল রথচক্রের এক-একটি চাকা, শক্তির রথে চড়ে' শতাব্দীর পর শতাব্দী নর-নারায়ণ চলেছেন, কোন্ শান্তির আনন্দের মিলনের যুগের দিকে,

কত কোটি তাঁহার বাহু, বিপুল তাঁহার শক্তি, দুঃখদ্বন্দ্বময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধর্ম্ম, জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে' কতরূপে তিনি চলেছেন। কখনও নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে রাজ্য পুড়িয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে— আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, নাদির, নেপোলিয়ান ; কখন আত্মার জ্ঞান-শিখা জ্বালিয়ে প্রেমের স্রোত বইয়ে—বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী—সে যুগে ইংরেজ বাঙালী কাফ্রীতে প্রভেদ থাকবে না, পুরুষ ও নারীর অধিকারে ভেদ থাকবে না, লোকে লোকে জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্য অর্থের জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনঝঙ্কার, শক্তিমন্তের রণহুঙ্কার থেমে গেছে,—মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় ভারত, আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, এই বন্দিনী দুঃখিনী ভারত, তার বুকের ধর্ম্মের আরতি-প্রদীপ ছিন্নমলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে তপস্বিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে,—

শ্রান্ত হয়ে সে চুপ করল। তাকে হাওয়া করতে লাগলুম। সে ধীরে বল্লে,—একটা গান গাও, 'বন্দে মাতরম্'।

বল্লুম,—না, তা শুনলে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। আর, যে সুর তুমি শুনেছিলে, সে সুর আমার গলায় নেই, আমার গলায় যে ঘা হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে পারি না।

আবার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠল—দেখছ, কি নির্ম্মম প্রকৃতি! কাউকে সে রেহাই দেয় না। ডাক্তার বলছিল, আমি বাঁচতে পারতুম, কিন্তু যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি, প্রকৃতি তার হিসেব রেখেছে, আজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছে। একটু গাও, সুরের সুধার জন্যে প্রাণটা তৃষিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মিষ্টি সুরের কয়েকটা হিন্দি গান গাইলুম। বন্ধু একটু শান্ত হল। ছোট শিশুর মত গানের সুরে সুরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গভীর হয়ে এল, ঝিল্লীর রবে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ ঝিমঝিম করছে, রাতের বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত মাঝে মাঝে অন্ধকার বাগানে মর্ম্মরধ্বনি। বন্ধুর রোগশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এল! ভাব্‌ছিলুম, বৌদ্ধযুগে সেই রাজা অশোকের সময় পৃথিবীতে যে দুঃখ দারিদ্র্য পাপ ছিল, সেই স্বার্থ দম্ভ শক্তির হানাহানি কিছু কমেছে কি? এখনও সেই জীর্ণ তৃণকুটীর, সেই অজ্ঞতা, ভীরুতা, অত্যাচার! এ অশোক চলে' যাবে, ওই তরুণ অশোক চলে' যাবে, মানবজাতি প্রেমশান্তির যুগের দিকে একটু এগোবে কি?

তারাগুলো মাথার খুব কাছে প্রদীপশিখার মত দপ্‌দপ্‌ করতে লাগ্‌ল। মনে হল—যুগে যুগে দেশে দেশে যারা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়ে এসেছে, তারাই অনিমেষ নয়নে এ বর্ত্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, আমাদের স্বপ্ন তোমরা কি সফল কর্‌লে, আমাদের মৃত্যু কি সার্থক হল?

এর পরের রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। শুধু যদি একরাতের জন্য আমার আগের গলাটা পেতুম, গানের সুরে ভিজিয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে' দিতুম। সে রাতে তার বিদ্রোহী মানুষ নয়, কবি-মানুষটি জেগে উঠেছে। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে সে যেন মাতাল হয়ে উঠ্‌ল,—আহা! কি মধুর জ্যোৎস্না! সমস্ত সৃষ্টি ফুটে এ কার হাসি, এ ভুবনলক্ষ্মীর অঙ্গের লাবণ্য, দেখ, দেখ। পৃথিবী-মা এতদিন তার সাত রং-এর আঁচল উড়িয়ে আমায় ঘুরিয়েছে—এই রক্তের লাল, আকাশের নীল, গাছপালার সবুজ, আলোর সীমাহীন শুভ্রতা,—আজ পৃথিবী-মা তার কোন্ সৌন্দর্য্য-অবগুণ্ঠন খুলে আমায় ডেকে নিচ্ছে,—যেখানে সব ঝরা পাতা, শুক্‌নো ফুল, মরুহারা নদী, মরা পাখীরা জমে। দেখ, দেখ, কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও জ্যোৎস্না, মোনালিসার মত অপূর্ব্ব হেসে আমায় ডাক্‌ছে—

শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিয়া হল, সে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল। ধীরে একবার জিজ্ঞাসা করলে,—গান্ধী কেমন আছেন? মহাত্মাজী?

গান্ধীর উদ্দেশ্যে সে বার বার প্রণাম কর্‌ল।

ধীরে বল্লুম—তিনি ভালই আছেন।

গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কারাগারে বন্দী, একথা ওই মৃত্যু-পথিককে বল্‌তে পার্‌লুম না।

হঠাৎ বন্ধুর চোখ বিদ্যুতের মত জ্বলে' উঠ্‌ল, সে বলে' উঠ্‌ল,—না, ওরা ওঁকে বন্দী কর্‌বে, জেলে পুর্‌বে; যীশুকে কি ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে হয় নি? এ যে অনেক দিনের জমা পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।

ভাব্‌লুম, সত্যই ত—এ ত আমাদের পাপের ফল। এতক্ষণ ভাব্‌ছিলুম, পশ্চিমদেশের বর্ত্তমান সভ্যতার ব্যর্থতার কথা, এ সভ্যতা ইঞ্জিন তৈরী করেছে, এয়ারোপ্লেন তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, রাজ্য জয় করেছে; কিন্তু মানবাত্মার স্বাধীনতা দিতে পার্‌লে না,—শুধু শক্তি দিলে, কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা ভীরুতার কথা ত ভাবিনি।

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হ'ল, এ যেন একটা বড় জাহাজ চির-অন্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে, যাত্রীরা জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি করে' চলেছে; জাহাজের উপর কি আছে, তলায় কি আছে, কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। কোন্ প্রবল জাতি কাপ্তান হয়ে জাহাজের হাল ধরে' চালাবে এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। আমার বন্ধু এ জাহাজের প্রান্ত হতে খসে মৃত্যুর অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিয়ে যাবে তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ধীরে বন্ধুর পাণ্ডুর মুখে চোখের-জলে-ভেজা একটি চুমো দিলুম।

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল, বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃত

হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দু'চারিটি কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত—liberty—equality—গান্ধী—অত্যাচারীর মুণ্ড—নরমুণ্ডের পাহাড়—নাদির—চাই রক্তের স্রোত—অতসী—বেহালা নয় রিভলভার—কে, জ্যোৎস্না ?—যাচ্ছি—পৃথিবী-মা—জ্বালাও আগুন—জাগো, জাগো—liberty—

ভোরবেলায় সপ্তর্ষিমণ্ডল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু চলে' গেলেন।

আজ রেণুর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়া চরকাটা সে আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ সাজাচ্ছিল, আর পার্‌লে না. ছাদের কোণে কাঁদ্‌তে গেল। অশোক পাশের ঘরে বসে' কাগজের জন্য লিখ্‌ছিল, স্বাধীনতার এ অগ্নি-প্রদীপখানি বন্ধু তার হাতে দিয়ে গেছেন। সেও আর লিখ্‌তে পার্‌লে না, রেণুর পাশে গিয়ে ছাদে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে, টাকা-পোতা টবটার পাশে।

আজ অবিরল ধারায় চোখের জল ঝর্‌ছে,—ঝরুক, প্রতিদিনই চোখের জল ঝর্‌বে।

আজ আকাশের এ উদার আলোর দিকে চেয়ে ভাব্‌ছি, রাঙা চেলীর ঘোম্‌টার নীচে সাহানার তানে আমাদের শুভদৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবগুণ্ঠনতলে তারার আলোয় জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় আত্মার সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে, আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে; আমি ধন্য হলুম।

———

সাগরিকা

সাগরিকা

—:•:—

বিকেলের আলো সুনীল জলে ঝলমল করছে—কিশোরীর দীপ্ত নয়নের চাউনির মত। শুধু-পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সাম্‌নের বালির রাশিতে সাগরের সাম্‌নেটা ঢাকা পড়েছে, তার শেষের ভাগ দেখা যাচ্ছে—কার শাড়ীর নীলপাড় আলোয়-ঝলমল, বাতাসে দুলছে। বালির ঢিপি পেরিয়ে চল্লুম। সমস্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এ কোন্ সুন্দরী নীলবসন জড়িয়ে সোনালী বালুচরে তনু এলিয়ে পড়ে' আছে, তারি বক্ষের গুরু গুরু ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, পৃথিবীর বুক হতে উৎসরিত অফুরন্ত ঝর্ণাধারার অবিরাম কল্লোলধ্বনির মত। তার বসনের রজতশুভ্র পাড়খানি পৃথিবীর পাড়ে ঠেকে সাপের ফণার মত দুলছে, কাঁপছে। একবার সে নীল অবগুণ্ঠন খুলে বেরিয়ে আসে না ?

বাঁশির তানের মত হাসির শব্দে চমকে উঠলুম। সাহেবদের কয়েকটা ছোট ছেলে মেয়ে ঢেউগুলোর সঙ্গে খেলা করছে, তাদের মাথায় তাল-পাতার টুপি, পরণে লাল swimming costume, তাদের দেখাচ্ছে ঠিক যেন জার্ম্মান রূপকথার বামনদের দল। এক একটি ঢেউয়ের কল্লোলময় স্পর্শে আনন্দ-হাসির ঝর্ণা ঝরে' পড়ছে। মনে হচ্ছে এ মাটির চেয়ে ওই ঢেউগুলোর সঙ্গে কি অজানা নিবিড় যোগ আছে, তারা যেন টান্‌ছে।

চক্রতীর্থের দিকে চলেছি। পাশে একটি ছোট মেয়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছে, আর তার সঙ্গে তার বাবা মা-ও ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছেন। এমন কাণ্ড যে হতে পারে, তা কি তাঁরা কলকাতা সহরের ক্ষুদ্র বাড়ীর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে' ভাব্‌তে পার্‌তেন! সিন্ধুর নানা অত্যাশ্চর্য্যকর লীলার মধ্যে এই লীলাটাই প্রথমে চোখে পড়্‌ছে, সে তার দুর্দ্দান্ত সজল স্নিগ্ধ হাওয়ায় বাঙ্গালী মেয়ের মুখ থেকে ঘোমটা খসিয়ে তার প্রাণকে মুক্তি দিয়েছে। ওই যে পেঁয়াজী রংএর শাড়ী পরে' নারী তাঁর স্বামীর পাশে পাশে চলেছেন, একটু ঘোমটা টেনে দিলেন, বাতাসে ঘোমটা সরে' গেল, আনন্দে রাঙা মুখের ওপর লালপাড় এসে পড়্‌ল—এ স্বপ্নাতীত বেড়াবার আনন্দ সমুদ্র সম্ভবপর করে' তুলেছে।

কচি বাঁশের পাতার মত একটি ছোট ছেলে ঝিনুক কুড়ানো ছেড়ে অবাক হয়ে সমুদ্রের পাড়ে চুপ করে' বসেছে। আমিও তার কাছাকাছি এসে বস্‌লুম, একেবারে ঢেউগুলোর পাশাপাশি। এর পাশে সাগরের তীরে বসে' মনে হচ্ছে এই জগৎ-পারাবারের তীরে আমি কত ছোট শিশু, যৌবন যে দ্বারে এসেছে, তা মোটেই মনে হচ্ছে না, বোধ হচ্ছে—এই সমুদ্রের ধারে ঝিনুকের মত সুন্দর শুভ্র আমার হারানো শিশু-মনকে আমি কুড়িয়ে পেলুম। একটি ছোট মেয়ে আনারসী রংএর শাড়ী পড়ে' কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে ঢেউগুলোর সঙ্গে খেলা কর্‌তে কর্‌তে চলেছে, ঢেউ-গুলো এগোচ্ছে, সে এগিয়ে আস্‌ছে, ঢেউগুলো পেছোচ্ছে, সে পেছিয়ে যাচ্ছে। তার সুন্দরী মা ও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন। বেণী দুলিয়ে শাড়ী উড়িয়ে খুকী দিব্যি ঢেউগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌ছে, কিন্তু তার মা পেরে উঠ্‌ছেন না। কল্লোলে উল্লাসে রজতশুভ্র হাস্যে নীলচঞ্চল সিন্ধুতরঙ্গ তাঁর অলক্তক-রাঙা চরণের ওপর অতর্কিতে লুটিয়ে পড়ে' একটু কাপড় ভিজিয়ে পরিহাসের সুরে দুল্‌তে দুল্‌তে চলে' গেল।

সুন্দরীর মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সিন্ধুতরঙ্গের মত সুন্দর হেসে আবার সুন্দরী চলেছেন।

উঠে আবার চল্লুম। একটি বৃদ্ধ তাঁর নাতী-নাৎনীদের সঙ্গে বসে' বালির পাহাড় তৈরী কর্‌ছেন। বালির পর বালি চাপিয়ে পাহাড় হল, ঝিনুক সাজিয়ে সহর হল, পথ হল, সহসা একটা ঢেউ বেলাভূমি লাফিয়ে এসে তাঁদের রচা জগৎটার ওপর পড়ে' ভিজিয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে দিলে, নাতি-নাৎনীর দল আনন্দে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল, বৃদ্ধ ভেজা লাঠি ধরে' কোনমতে ঢেউয়ের মুখ থেকে সরে' দাঁড়ালেন। ঢেউ চলে গেল, ছেলেমেয়েরা আবার বালির নতুন ঘরবাড়ী তৈরী কর্‌তে সুরু কর্‌ছে, বৃদ্ধ কিন্তু এবার চুপ করে' সাগরের দিকে চেয়ে বসেছেন। উদাস চোখে যেন সমস্ত জীবনের কথা ভাব্‌ছেন।

চক্রতীর্থের কাছে এসে পড়েছি। ছোট মন্দিরের সাম্‌নে ধূসর বালু-চরের ওপর সবুজ ঘাসের ফ্রেমে একটু স্নিগ্ধ কালো জল বাঁধা রয়েছে, বিকেলের আলোয় জলটুকু কৃষ্ণসারের গায়ের চামড়ার মত পাতা রয়েছে। পিছন ফিরে তাকালুম, পশ্চিমদিক পীতবর্ণ মেঘে ছাওয়া, ঝাউগাছের পিছন দিয়ে রূপোর চাকার মত সূর্য্য ঘুরে চলেছে, তার পাশ দিয়ে কয়েকটি নীল হাল্কা মেঘ উড়ে চলেছে—পাখীর পালকের মত। Flag-staffটা সঙ্গীনের খোঁচার মত নীলিমার দিকে উঠে গেছে।

পীত রং ঘোর লাল হয়ে আস্‌ছে, সূর্য্য রক্তবিন্দুর মত জ্বল্‌ছে, সব মেঘ রক্তচন্দনের মত রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে, রাঙা আকাশের পটে ঝাউগাছের সবুজ সারি ছবির মত আঁকা, তাদের মাথা ছাড়িয়ে জগন্নাথের মন্দিরের শ্বেত চূড়া, মেঘবিচ্ছুরিত সূর্য্যালোকে আরতি-প্রদীপের শুভ্র শিখার মত জ্বল্‌ছে।

একা এগিয়ে চলেছি। আর লোক নেই, লোকালয় নেই, জনহীন

পথহীন বালুচর সম্মুখে, এক পাশে চির কল্লোলময় চিরচঞ্চল সাগর, আর একদিকে চিরস্থির চিরস্তব্ধ পৃথিবী।

বাঁ দিকে বালির পাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট সবুজ তৃণ হাত-ছানি দিয়ে ডাকৃছে। সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্বর্গ-দ্বারের ওধার হতে চক্রতীর্থের ওধার পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখাচ্ছে। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সমস্ত চক্রবাল দেখা যাচ্ছে, তার অর্দ্ধেক আগুনের রঙে রাঙা, অর্দ্ধেক আঁখির জলে কালো। মনে হচ্ছে, একটা বড় পেয়ালা, তার অর্দ্ধেক আগুনে টলমল, অর্দ্ধেক অশ্রুজলে ছলছল। সমুদ্রের কলধ্বনি স্বপ্নের সুরের মত বাজ্‌ছে।

চারিদিক রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে, যেন কার গোধূলি-লগন এসেছে, গলানো সোনার মত রাঙা আলো মেঘ হতে ঝরে' ঝরে' নীলবনরেখার মাথার ওপর দিয়ে তরঙ্গায়িত ধূসর প্রান্ত পার হয়ে সিন্ধুতরঙ্গের মাথার ওপর অলক্তকের স্রোতের মত গড়িয়ে পড়্‌ছে। স্তব্ধ হয়ে বস্‌লুম।

একাকিনী উদাসিনী সন্ধ্যা কত বনপর্ব্বত কত নগর গ্রাম পার হয়ে রাঙা আঁচলখানি কালোনীল জলে লুটিয়ে আকাশভরা করুণনয়নে পৃথিবীর দিকে চেয়ে সোনালী-চেলীপরা বধূর মত অনন্ত সমুদ্রের তীর দিয়ে একটু অবগুণ্ঠন টেনে কার অভিসারে চলেছে; দিগ্বধূরা তার পথের ধারে ধারে রাঙা আলো জ্বালিয়ে ধর্‌ছে, প্রতি তরঙ্গে তার পায়ে লালমণি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমকোণের রাঙা আলো কালো হয়ে আস্‌ছে। পূর্ব্বকোণে আকাশ-সাগরের মিলনভূমির স্নিগ্ধ নীল অন্ধকার হতে রাত্রি ধীরে ধীরে তারাভরা আঁচল মেলে লক্ষ লক্ষ সাপের মণিময় ফণা দিয়ে রচা গর্জ্জমান তরঙ্গদলের দোলায় চড়ে' ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

ধীরে উঠে আবার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্লুম। একে একে তারা ফুটে উঠ্ছে। স্তব্ধ স্নিগ্ধ অন্ধকারময় আকাশ-সাগরে আলোর ঢেউ উঠ্ছে। জোরে এগিয়ে চলেছি। তীরের বাড়ীগুলো দেখাচ্ছে পরম বিস্ময়কর ছায়া, লোকজন দেখাচ্ছে অপূর্ব্ব মায়া। কতজন পাশ দিয়ে আস্ছে, যাচ্ছে, তাদের খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু বোঝা যাচ্ছে পুরুষ কি নারী, তরুণী কি বৃদ্ধা।

জোয়ার আস্ছে, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে অকূল হতে কোন হাওয়া এসে পৌঁছেচে, সেই সজল স্নিগ্ধ হাওয়ায় সব উড়্ছে, আমার চাদর উড়্ছে, ওই তরুণীর আঁচল উড়্ছে, ওই মেয়েটির কালো বেণী উড়্ছে, ওই খুকীটির রঙীন ফ্রক উড়্ছে, ওই মহিলার ঘোমটা বার বার উড়ে' সরে' যাচ্ছে, ওই বৃদ্ধের কোঁচা উড়ে চলেছে।

এতক্ষণ সিন্ধুর মুখে ছিল হাসি, এবার গান বেজে উঠেছে। কি বল্তে চায়, সে কি বল্তে চায়? একেবারে ঢেউগুলোর সাম্নে জোয়ার-জলের ফেনায় ভেজা হাওয়ার মুখে এসে বস্লুম। দূরে একটি বৃদ্ধ দম্পতী বসে' আছেন। শুভ্র শ্মশ্রু দেখে বৃদ্ধটিকে অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বৃদ্ধাটিকে একটি ছোট মেয়ে বলে' বোধ হচ্ছে। এই জোয়ারের ঢেউয়ের গান কি সবাইয়ের কানে এক সুরে বাজ্ছে? এই বৃদ্ধ দম্পতীর কানে সিন্ধু কি বল্ছে? আর ওই যে যুবকটি উচ্ছল যৌবন নিয়ে সিন্ধুতরঙ্গের মত উদ্দাম মনে বসে আছে, তার কানে কি বল্ছে? আর ওই যে খুকী এখনও অন্ধকারে বালির ঘর তৈরী কর্ছে, তাকে কি বল্ছে? আর ওই যে তরুণী ঝিনুক কুড়োবার ছল করে' একটি তরুণ যুবকের মুখ বার বার দেখে নিচ্ছে তাকেই বা কি বল্ছে?

তিনটি মেয়ে আমার কাছে পাড়ে এসে বস্‌ল। অন্ধকারে মুখ

দেখা যাচ্ছে না, শুধু কাপড়ের রং বোঝা যাচ্ছে, আর বোঝা যাচ্ছে, একটি কিশোরী আর দুটি ছোট মেয়ে। শীকরসিক্ত বাতাসে আমার পাঞ্জাবী কাঁপ্‌ছে, কিশোরীর সাড়ীটা দুল্‌ছে, ছোট মেয়েগুলির চুলগুলো নাচ্‌ছে, ঢেউগুলোতে কত প্রবাল মুক্তা টলমল কর্‌ছে।

কিশোরীটি কি গান ধরেছে। কথা বোঝা যাচ্ছে না, সমুদ্রের গানে সব কথা সুর ভেসে যাচ্ছে। কানটা খুব সজাগ করে' শুন্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। ঢেউটা যখন ফিরে গেল, একটি কথা ভেসে এল,—দোলাও...

দোলাও, হে সিন্ধু, এই আলো-অন্ধকারের দোলা, সুখ-দুঃখের হাসিকান্নার জন্ম-মৃত্যুর দোলা; হৃদয় আমার তোমার প্রেমের দোলায় দোলাও।

মেয়ে তিন্‌টি উঠে চলেছে। বেলাভূমি জনবিরল হয়ে আস্‌ছে। এবার তরঙ্গের কুন্দশুভ্র দোলায় চড়ে' কারা যেন পৃথিবী দেখ্‌তে আস্‌ছে, পেছনের পর পেছন উঁকি মেরে আস্‌ছে, কিন্তু তটের কাছে এসেই সঙ্কোচে সত্রাসে সলজ্জ হাস্যে সাগরে নিমেষে লুকিয়ে পড়্‌ছে, শুধু তাদের মণি-মুক্তা-বিজড়িত অবগুণ্ঠন ফেনায় লুটিয়ে পড়্‌ছে। বালির ওপর কি ঝিকিমিকি!

এবার সাগরের গান বুঝ্‌ছি। সে ডাক্‌ছে—বল্‌ছে, এস, এস। মণি-মুক্তা দিয়ে গড়া সাগর-রাজপুরীর প্রবালপালঙ্কে কোন সাগরিকা এম্নি তরঙ্গ-নাগিনীর লক্ষমণিময় ফণার শয্যায় শুয়ে আছে, তারি বিরহ-বেদনা ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকুল হয়ে উঠ্‌ছে,—এই বিরহ-মিলন হাসি-কান্নার দোলা থেকে সব চাওয়া পাওয়া ছেড়ে সব ঢেউ-খাওয়া শেষ করে' ঘন নীল জলে ডুবে অতলে নেমে এস।

স্তব্ধ হয়ে এই দ্যুতিময় গর্জ্জমান অন্ধকারের দিকে চেয়ে' বসে' আছি। সিন্ধু শুধু ডাকে ডাকে আর ডাকে।

(২)

ঘুম ভাঙ্‌তেই ঢেউগুলোর ডাক কানে এসে বাজ্‌ল। সারারাত তারার আলোয় তাদের কাছাকাছি তাদের বাঁশি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমের দোলায় দুলেছি, জেগে উঠেই ঢেউগুলোর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম।

তসরের শাড়ীর মত পূর্ব্বাকাশ মেঘে ছাওয়া, সকালের আলো কচি শিশুর হাসির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, ঢেউগুলোর মুখেও সেই হাসি। এই প্রথম সমুদ্র দেখেই মনে হয় এর সঙ্গে যেন কত যুগের নাড়ীর যোগ, কত জন্মজন্মান্তরের চেনা।

এক তরুণী সূর্য্যের দিকে মুখ করে' ধীরে চলেছে। দেখেই মনে হল কালকের সেই কিশোরী। সে যে, তা কেমন করে' জান্‌ব? সন্ধ্যার ছায়ায় তার মুখ ত ভাল দেখা যায়নি, তবু নিশ্চয় জানি এ সে। তার সুঠাম মধুর মূর্ত্তি ছবির মত প্রভাতাকাশের পটভূমিকার নীলজলের কোলে আঁকা। কখন না দেখেও যে নিমেষে চিরপরিচিত বলে' চেনা যায়, এ অনুভূতি যার হয় নি, সে এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। কাউকে চিনি চোখের চাওয়ায়, কাউকে চিনি হাতের ছোঁয়ায়, কাউকে চিনি মনের লেখায়, কেউ আসে গানের সুরে, কেউ যায় ফুলের-গন্ধে-ভরা হাওয়ায়। কাল যে অন্ধকারে কাছাকাছি বসে' ছিলুম, তাইতে কি করে' পরিচয় হয়ে গেছে, তা আমিও জানি না।

মেয়েটি মুখ ফিরে চাইল। নিমেষের জন্য তার চোখ দুটো দেখ্‌লুম, সিন্ধুর মত অতলস্পর্শ। জীবজন্মের পূর্ব্ব যুগে বিরাট সাগর মাতার বুকে পৃথিবীকন্যার আসন্ন-প্রতীক্ষা-পূর্ণ অজানা বেদনাময় যে আলো জ্বলে উঠ্‌ত এ কিশোরীর নয়নে সেই নবসৃষ্টির চিররহস্যময় আলোর রূপ দেখ্‌লুম। এই আদিজননীর পাশে পৃথিবীর এই ছোটমেয়েটিকে

অত্যাশ্চর্য্যকর দেখাচ্ছে। তার চোখে কি স্বপ্নের মায়া, বক্ষে কি নবপ্রাণ-সৃষ্টির আয়োজন দিনে রাতে চলেছে, তা সে নিজেও জানে না। মেয়েটি বালির পাড়ে বসে' পড়্‌ল। তার পাশ দিয়ে চলে গেলুম।

তার চুলগুলো ঢেউয়ের মত দুল্‌ছে। একবার সে চাইল, উৎসুক লজ্জা ও একটু বিরক্তিমাখান কি সুন্দর চোখ দুটো। মুখের গঠন ঠিক বোঝা গেল না। উজ্জ্বল শ্যাম রং,—এ রং মত্ত করে না, মুগ্ধ করে। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ সঞ্চারে বর্ষার মল্লারতানে যে রং ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিউরে ওঠে, শরতের সোনার ধানক্ষেতের ধারে নদীর জলে যে রং ঝিকিমিকি করে সেই দীপ্ত স্নিগ্ধ রং।

কচি ঘাসের রংএর শাড়ী বাতাসে পালের মত ভরে' উঠ্‌ছে, পদ্মের মত রাঙা পাড় বালির ওপর লুটিয়ে পড়েছে, মেয়েটি স্নিগ্ধ উদাস চোখে সাগরের দিকে চেয়ে বসে' রয়েছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন একটী ছোট মেয়ের সাজ পরে' আদি জননীর মুখের দিকে চিরবিস্ময়কর মুখে চেয়ে বসে আছে—আর এই চিরতন্দ্রাহারা মাতা স্নিগ্ধহাস্যে বল্‌ছে, তোমার মধ্যেও নব নব রূপ সৃষ্টির আনন্দে পাগল চিরনবীন জীবনের নব নব পর্য্যায় উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কিশোরীর ভয় নেই।

মেয়েটির বয়স কত? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, বিদ্যাপতি যে বয়স উপলক্ষ করে' লিখেছেন—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল॥

এ সেই বয়ঃসন্ধি।

আর তার নাম? হুগোর Toilers of the Sea-এর প্রথম পাতাগুলো মনে পড়্‌ছে। এখন যদি সে একটি ঝিনুক দিয়ে বালির উপর তার নামটি লিখে চলে' যায়!

এখন যদি আস্তে আস্তে গিয়ে ধীরে তার পাশে বসে' একটু গল্প করি। বলি—আমার নাম প্রভাত, তোমার নাম কি? সে হয়ত হেসে বল্‌বে, ঝিনুক।

এই উন্মুক্ত উদার প্রভাতাকাশতলে অনন্ত সমুদ্রতীরে এই রকম পরিচয় করাটা যে কি সহজ সরল সুন্দর স্বাভাবিক তা বুঝ্‌তে পার্‌লেও সমাজের অনুশাসনপাশ একেবারে খসিয়ে ফেল্‌তে পার্‌ছি না।

এগিয়ে চলেছি, মেঘগুলো কাটিয়ে সূর্য্য আলোর রথ হাঁকিয়ে চলেছে। মেয়েটি উঠে চলে' যাচ্ছে। ধীরে সূর্য্যহসিত সিন্ধুর দিকে চেয়ে বস্‌লুম।

(৩)

সাগরের হাওয়ার চেয়ে জলের স্পর্শ মধুরতর কি না বল্‌তে পারি না, কিন্তু সাগরজলের ছোঁওয়া কি মাদকতায় ভরা! ঢেউয়ের মত দেহের রক্ত কোন বিশ্ব-আনন্দের ছন্দে নেচে ওঠে তা আজ প্রথম স্নান কর্‌তে গিয়েই বুঝ্‌লুম।

প্রথম ঢেউটা ফুলের শুভ্র পরাগের মত একেবারে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে' মধুর আহ্বান করে। একটু এগিয়ে গেলুম। এবার কিন্তু ঢেউটা কোমরের কাছে সজোরে আঘাত কর্‌লে, বালির রাশি চাকার মত ঘুরিয়ে গুলিয়ে আমার কটিতট সজোরে বেষ্টন কর্‌লে। আরও একটু এগিয়ে এলুম, এবার ঢেউয়ের কি আবেগের স্পর্শ, গলার কাছ পর্য্যন্ত এসে সমস্ত দেহ মৃদু দুলিয়ে হেসে তটের ওপর ভেঙ্গে পড়্‌ল। আরও এগিয়ে গেলুম, এবার সে বিজয়িনীর মত মুক্তার কিরীট পরে' আস্‌ছে, তার যাত্রাপথের তলায় মাথা নত করে' দেহ লুটিয়ে দিলুম, মাথার উপর তার জয়রথের চক্র মন্দ্রিত শব্দে চলে' গেল। মাথা তুলে

সম্মুখে চাইলুম, এবার সে আস্‌ছে শুক্তির চতুর্দ্দোল চড়ে' হাস্‌তে, হাস্‌তে, আবার তার পায়ের নীচে মাথা পেতে দিলুম, চতুর্দ্দোল চলে' গেল, আমার কালোচুলের উপর হীরার ফুল ফোটাতে ফোটাতে।

কয়েকটা ঢেউ খেয়ে বালির তীরে এসে বস্‌লুম। কারা যে চারিদিকে স্নান কর্‌ছে, তা এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। ফিরে একটু দেখি সেই মেয়েটি একটু দূরে বসে' আমার দিকে চাইছে, আমি চাইতেই সে মুখ ফিরিয়ে ভিজে বালি খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। সেও কিছুক্ষণ স্নান করে' বিশ্রাম নিতে বসেছে। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে দুজনকেই দুইদিকে ঘুরিয়ে একটু ভাসিয়ে তুল্‌ল। তার চোখটা আমার মুখের উপর এসে পড়্‌ল। ঢেউ চলে' গেল, একটু নীচে টেনে গেল, বালি মেখে দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে বস্‌লুম। আবার একটা ঢেউ ধীরে স্পর্শ কর্‌ল, দুজনেই একসঙ্গে মুখ ঘোরালুম, চকিতে দুজনেই চোখ ফিরিয়ে ঢেউ-গুলোর উপর সূর্য্যের ঝিকিমিকির দিকে চাইলুম।

চোখ দুটো সত্যি কি? সে কি বাতায়ন? প্রাণের ঘরের বিরহিণী নারী সেখানে বসে' জগৎপথের দিকে চেয়ে কার প্রতীক্ষা কর্‌ছে? না, সে পাখী, দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে উদাসভাবে চাইছে আর চাইছে।

ধীরে মেয়েটি স্নান কর্‌তে উঠে দাঁড়াল, সমুদ্রের দিকে চাইল; বালিভরা আঁচলটা ঝেড়ে কোমরে বাঁধ্‌ল—সাদা কাপড়টা বালির রং-এর হয়ে গেছে। নুলিয়ার হাত ধরে' এগিয়ে চলেছে, ঢেউয়ের ফণার মত তার বেণী উন্নত হয়ে উঠেছে। প্রথম ঢেউ তার কটি ফেনার মেখলায় ঘিরেছে, যেন তরঙ্গ-ভুজঙ্গ বালির তটকে শুভ্রফণা তুলে দংশন কর্‌বার জন্য আস্‌ছিল, সহসা সম্মুখে কিশোরীকে দেখে সংযত হয়ে ফণা কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌ল। এবার ঢেউটা কিশোরীর তনু শুক্তির

মত আপন বুকে নাচিয়ে তুলে নিল। তার বিপর্য্যস্ত অলকগুলিতে মুক্তা দুলিয়ে সে তার আঁচলে মেয়েটিকে কোথায় লুকাল।

আমিও স্নান করতে নামলুম। যে ঢেউগুলো মাথার ওপর দিয়ে যায় না, গলাটা ফেনার মালা দিয়ে জড়িয়ে বুকে একটু আঘাত করে' দেহ দোলা দিয়ে যায়, সেই ঢেউগুলি সব চেয়ে আরামের।

হঠাৎ একটা ঢেউ মাথার উপর এল, অজগরের কিরাট ফণার মত, তার তলায় মাথা একেবারে লুটিয়ে দিলুম। মাথা তুলে দেখি' মেয়েটি আমার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, সূর্য্যহসিত তরঙ্গফেনার মত তার চোখদুটি আনন্দদীপ্ত।

আর একটা ঢেউ বিপুলগর্জ্জনে দুজনকে ডুবিয়ে কাঁপিয়ে তলিয়ে নাচিয়ে দুলিয়ে আবার ভাসিয়ে তুলল। তার অলকগুলি মুখের উপর এসে কাঁপছে, আঁচল খুলে ভাসছে, মুখখানি কাশের মত ফেনার ফুলদলের মধ্যে বর্ষাধারাফুল্ল কেতকীর মত দুলছে।

নিমেষে মুখখানি সরে' গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ। দুজনে এক ঢেউয়ে দুলছি, ডুবছি, ভাসছি।

আবার দুজনে উঠে ভিজে বালির উপর গিয়ে বসলুম, একটু দূরে দূরে। উল্টোদিকে চেয়ে বসে' ছিলুম; একটা ঢেউয়ের টান আটকাতে বালির তট একটু আঁকড়ে ধরে' ওদিকে চাইতেই দেখি সেও চেয়েছে, ঢেউয়ের ধাক্কায় একসঙ্গে দুজনে ঘুরে গেছি।

আবার দুজনে স্নান করতে উঠলুম, একটু দূরে দূরে। অনেক ঢেউ খেয়ে যখন শ্রান্ত হয়ে উঠেছি, দেখি মেয়েটি ঢেউ খেতে খেতে আমার কাছেই এসে পড়েছে, সূর্য্যহসিত সুনীলজলধির মত তার মুখখানি, তার চোখদুটি কখনও তরঙ্গফুলগুলির মত জ্বলে উঠছে, কখনও দিগ্বধূর চাউনির মত উদাস মধুর।

(৪)

সুন্দর সকালবেলাটা, দিনটা যেন নীলসাগরের বুক থেকে একটি শ্বেতপদ্ম—দিকে দিকে আলোর পাপ্‌ড়ি মেলে ফুটে উঠ্‌ছে।

মাঝে মাছে দুচারটে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছিলুম, পিছনে ফিরে তাকাইনি, তবু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম পিছনে সে মেয়েটি আস্‌ছে।

পিছন ফিরে চাইলুম সত্যিই সে আস্‌ছে। তার সঙ্গে আর-একটি ছোট্ট মেয়ে—তারা ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে আস্‌ছে। একটা রংচংএ বড় ঝিনুক কুড়োবার বেলায় তার চোখ দুটো আমার মুখে এসে পড়্‌ল; কি দুষ্টামিভরা হাসি! তারপর ছোট মেয়েটির উড়ে-যাওয়া চুলের আড়ালে মুখ লুকাল।

দূরে কতকগুলো জেলে জাল বুন্‌ছে আর গল্প কর্‌ছে, তাদের পাশ দিয়ে মেয়ে দুটি চলে' গেল।

আকাশ মেঘে ছেয়ে আস্‌ছে, দিনটা ছোট মেয়ের মত, মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় ক্ষণিক হাসি-কান্নায় ভরা। দিগন্ত কালো আঁখির মত জলে ভরে' উঠ্‌ছে, সাগরে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়্‌ছে।

মেয়ে দুটি একটু দূরে বসেছে, দুজনে বালি খুঁড়ে একটা বড় গর্ত্ত তৈরী কর্‌ছে, ছোট মেয়েটির উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি সাগরের হাসি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে, কিশোরীর স্নিগ্ধ মুখের ছবি ছোট মেয়েটির মুখের আড়ালে মাঝে মাঝে শরৎ-শেফালির সুগন্ধের মত ভেসে আস্‌ছে।

গুঁড়িগুঁড়ি বিষ্টি পড়্‌ছে, ছোট ছোট ফোটা, বালির ওপর কোন শব্দ হচ্ছে না, চোখ-মুখের ওপর দু-চারটি ফোটা পড়্‌ল, কচি শিশুর আঙ্গুলের মিষ্টি ছোঁয়ার মত।

হাওয়া মেতে উঠেছে, বড় বড় ফোঁটায় বিষ্টি পড়্‌ছে। মেয়ে দুটি

গর্ত্তটায় ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসে' একটি ছোট ছাতা খুলেছে, কি একটা গল্প সুরু করেছে, ছোট মেয়েটি নিবিষ্ট মনে শুন্‌ছে আর জোরে ছাতা ধরে' আছে। ছোট ছাতা, দু তিনটে শিক থেকে কাপড় খুলে গেছে, ছেঁড়া পালের মত ছাতাটা বাতাসে কাঁপ্‌ছে।

মনটা উদাস হয়ে উঠ্‌ছে। কাছে একটা নৌকা পড়ে' আছে—বড় কালো ঝিনুকের মত। তার কাছ ঘেঁসে বসে' গর্ত্ত খুঁড়ে পা দুটো বালিতে ঢেকে আমিও ছাতা খুলে বস্‌লুম।

হু হু করে' হাওয়া আস্‌ছে, ঢেউগুলো মাতাল হয়ে নাচ্‌ছে, ছাতার ওপর বিষ্টির ধারা মাদল বাজাচ্ছে। ওদের ছাতা উঠ্‌ছে, আমার ছাতা পড়্‌ছে, আমার ছাতা উঠ্‌ছে, ওদের ছাতা পড়্‌ছে, বিষ্টির ধারার মধ্যে মেয়েটির নয়নের দৃষ্টি বিদ্যুতের স্নিগ্ধ ঝিল্‌কির মত এসে সোনার কাঠির মত মনকে স্পর্শ কর্‌ছে।

কাজলঘন আকাশের মত মনটা ভারি হয়ে উঠ্‌ছে। ওদের ছাতার দোলানি দেখ্‌ছি। ঝিনুক বালি নাড়্‌তে নাড়্‌তে মেয়েটি কি গল্প বল্‌ছে।

একটি বোনের জন্যে মন কেমন কর্‌ছে। হয়ত সে কল্যাণী তার মঙ্গলগৃহকর্ম্মের মধ্যে সহসা আনমনা হয়ে আমার কথা এখন একটু ভাব্‌ছে। ভাব্‌ছি, বোনের আনন্দনিষ্ঠাপূর্ণ হস্তের স্পর্শ মাধুর্য্যময় স্নেহসঙ্গ যে পেল না এ জীবনে তার কতখানি ফাঁক রইল।

ইচ্ছে কর্‌ছে, ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ওই খুকীটির মত বসে' তার মুখ থেকে তার সহজ সরল গল্পটা শুনি।

বিষ্টিটা কমে' এসেছে। ছাতাটা মুড়ে নৌকায় হেলান দিয়ে এই ঝিরি ঝিরি জলধারায় ভিজ্‌ছি। ওরাও ছাতা মুড়ে উঠে দাঁড়াল, ছোট মেয়েটি ছাতা নিল, বড় মেয়েটি ঝিনুকের বোঝা।

এদিকে এগিয়ে আস্ছে, ঈষদার্দ্র ঘননীল শাড়ীর পাড় বালির ওপর লুটিয়ে পড়্ছে। একবার ফিরে চাইল, সাম্নে দিয়ে চলে' গেল, ছোট মেয়েটি বার বার বেলফুলের কুঁড়ির মত চোখ দুটো নেড়ে ফিরে ফিরে চাইছে।

বিষ্টি থেমে গেছে, সমুদ্র শান্ত হয়ে আস্ছে, আকাশ কি স্নিগ্ধ নীল। একটি ঢেউ এসে বেলাভূমিতে মেয়েটির পায়ের দাগ মুছে দিয়ে গেল। চুপ করে' মেঘ ও রৌদ্রের লীলা দেখ্ছি, এই আলোর দোলা, জলের কম্পন, সুকোমল নীল বিস্তৃতি।

(৫)

পূর্ণিমার চাঁদ পূবগগন ছাড়িয়ে উঠেছে, শুভ্র লঘু মেঘে ছাওয়া সুনীল পথ দিয়ে মোহিনী তার বুকের আলোক-সুধাভাণ্ড হতে দিকে দিকে অমৃতবণ্টন করে' নৃত্যময়ী উর্ব্বশীর মত এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, সাগর ভরে' সুধা টলমল কর্ছে, এ নীল পাত্রখানি কে আমার সম্মুখে জ্যোৎস্নার অমৃতে ভরে' ধরেছে, চির-তৃষিত আমি তার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রূপের ঝর্ণা ঝরে' পড়্ছে তারালোক হতে পৃথিবীর দিকে, রসের ফোয়ারা উথ্‌লে উঠ্ছে সবুজে সুনীলে, পৃথিবীর বুক হতে অনন্তের দিকে, মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছি।

আজ ঢেউগুলো ডাক্ছে না, আজ তারা জয়ধ্বনি কর্ছে, বল্ছে— এসেছে সে এসেছে। চাঁদের আলো বালিতে ঝিনুকে ঢেউয়ের ফেনায় মেয়েটির মুখে আমার চোখে ঝিকিমিকি কর্ছে।

কিশোরীটি একটু দূরে বসেছে, আজ সে একা, গান গাইছে না, আমারি মত পূর্ণিমার সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে' আছে। জ্যোৎস্না-ধোওয়া আকাশের পটভূমিকায় নীলশাড়ীমণ্ডিতার মূর্ত্তি নিপুণ শিল্পীর ছবির মত আঁকা।

এখন যদি ওই মেয়েটি এসে জ্যোৎস্নার মত হেসে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, আমি কিছুই অবাক হব না, আমার মনে হবে না এ এক মাটির দেশের মেয়ে, আমার কাছাকাছি এর বাড়ী ; আমি বেশ ভেবে নিতে পারি, সাগরের অতলজলে প্রবালমুক্তা-ঘেরা রাজপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা আজ পূর্ণিমায় জেগে উঠে এই জ্যোৎস্নাহসিত সিন্ধুর অবগুণ্ঠন খুলে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঢেউগুলো সেতারের তারের মত কেঁপে বেজে উঠ্‌ছে। এসেছে, সে এসেছে।

কালো মেঘে চাঁদ ঘিরে ফেলেছে, অন্ধবেগে বাতাস ছুটে আস্‌ছে, অন্ধকার তটের কাছে ঢেউগুলো কাশফুলের ঝাড়ের মত দুল্‌ছে।

মেয়েটি কখন উঠে চলে' গেছে, দেখিনি। বেলাভূমি বিজন। শীকরসিক্ত বাতাসের মত্ত মুখে অন্ধকার সাগরের সাম্‌নে বালির পাড়ে শুয়ে পড়েছি।

চাঁদ ডুবে গেছে, ঢেউগুলো গর্জ্জন কর্‌ছে, কোন রুদ্ধ আবেগে অজানা বেদনায় ফুলে ফুলে তটের ওপর আছাড় খাচ্ছে। মেয়েটির একটি গানের সুর কানে এসে বাজ্‌ছে, অন্ধকারে কোথায় সে বসেছে জানি না—আঁধার ঘরে চুপে চুপে এস কেবল সুরের রূপে।

(৬)

দ্বিপ্রহরের তীব্রোজ্জ্বল-সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত সিন্ধুর দিকে চেয়ে বসে' আছি। ধূসর উদার অবারিত বালুচর বসুন্ধরার রৌদ্রদীপ্ত হিরণ্য অঞ্চলের মত লুটিয়ে পড়েছে, তার একটুকু প্রান্তে আমি আর নৌকোটা বসে' আছি। নৌকোটাকে মনে হচ্ছে আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের পায়ের চটিজুতো, রূপকথায় যে জুতো নিমেষে নগর বন পর্ব্বত নদী সমুদ্র পার করে' রাজকন্যার শিয়রে পৌঁছে দেয়।

নির্ম্মল নীল আকাশ, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা কে উপুড় করে' ধরেছে গলানো নীলকান্তমণিতে গড়া পেয়ালার ওপর। এই সাগরের জলে ধোয়া আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই সুনীল নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় অসীমতার সম্মুখে একা বসে' মনে হচ্ছে, এ সাগরের সঙ্গে কত জন্মের জানাশোনা। কত গতজীবনের সুখস্মৃতিরাশি, কত শরৎপ্রভাতে সোনার আলোয় দোলা, কত জ্যোৎস্নারাতে প্রবাল-ঘরে খেলা, এই নীলাম্বরতলে ঋতুতে ঋতুতে কত লীলা—সেই-সব পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতিগুলি জন্ম-জন্মান্তরের অতল সমুদ্র হতে ঢেউয়ের মত ভেসে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার চারিদিকে কোন গত ও অনাগত দিবাস্বপ্নের মায়াজাল।

জমাট তরঙ্গফেনপুঞ্জের মত সাদা মেঘ আকাশে ভেসে চলেছে, সাগরে তাদের ছায়া পড়্ছে। তটের নিকট সাগর জুঁইফুলের ঝাড়ের মত সাদা; যেখানে প্রথম ঢেউ শুক্তির কিরীট পরে' মাথা তুলেছে, সেখানে সাগর একটু পাটলবর্ণ, তার পর একটু স্নিগ্ধ সবুজ, তার পর সুস্নিগ্ধনীল। দূরে পিঙ্গলআভাময় মেঘের ছায়ায় সাগর ধূসর সোনালী হয়ে উঠেছে। যেন একখানি নানা-রংএর চিত্রকরা গালিচা গগনের নীল প্রান্ত পর্য্যন্ত পাতা রয়েছে। আকাশে নানা-রংএর ছোপ। পূর্ব্বকোণটা স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মত, উত্তরকোণ মেঘে নিকষমণির মত কালো, সম্মুখে মধুর নীলিমা, মাথার ওপর পাখীর পালখের মত হাল্কা মেঘে সূর্য্য ঢাকা-পড়ে' গেছে, আলো তেজহীন স্নিগ্ধ।

চারিদিক্ নিঝুম, সাগরতীর বিজন। সম্মুখে বালির ওপর কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ের পায়ের দাগ দেখ্ছি, ওই বালির পটে আঁকা কচিপায়ের ছবিগুলি ভারি সুন্দর দেখ্তে। এখন যদি কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে পাই, তাদের সঙ্গে এই মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুপুরে কল্পনার রঙীন ঢেউয়ে চড়ে' বাস্ত-

বতার বালিতট ছেড়ে গল্পের সাগরে পাড়ি দি, বিচিত্র ব্যাপার অদ্ভুত কাণ্ড অসম্ভব কথার দেশে হাজির হই।

ভেবেছিলুম আমি বুঝি একা বসে' আছি। মুখ তুলে চাইতেই দেখি নৌকার অপর দিকে বালিতে ডিঙির মত একটি সরু লম্বা গর্ত্ত করে' মেয়েটি হেলান দিয়ে বসে' আছে। চকিতে তার দিকে চেয়ে নৌকার আড়ালে লুকালুম।

মনে হচ্ছে আজ যেমন দু'জন নৌকার দুদিকে কাছাকাছি বসে' আছি, তেম্নি কতজন্ম এই সাগরজলে পাশাপাশি কাটিয়ে এসেছি। যুগ যুগ পূর্ব্বে যখন এই মাটির পৃথিবী সাগরের নীল ক্রোড়ে জন্মলাভ করেনি, সেই সৃষ্টির উষায়, এই সিন্ধুবক্ষে কি অজানা আনন্দে অন্তর্নিগূঢ় ব্যথায় আমরা দু'জন তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁপেছি, দুলেছি, প্রবালে জ্বলেছি, ফেনায় ঝিকিমিকি করেছি। তারপরে যখন পৃথিবী-কন্যা সমুদ্রের কোলে জন্ম নিল, সমুদ্রমেখলার কোলে জীবনধারা সুরু হল, সেই সুদীর্ঘ আনন্দময় নব নব প্রাণের অভিব্যক্তিপথের বাঁকে বাঁকে আমরা কতবার পাশাপাশি এসে পড়েছি। সবুজ লতায় হিল্লোলিত হয়ে, হাওয়ার মত্ত স্পর্শে পল্লবিত মুঞ্জরিত হয়ে এম্নি কোন সাগরতীরে দু'জনে মিলে কত অরুণ-আলোর ধারা, বর্ষার বারিধারা আকণ্ঠ পান করেছি। উদ্ভিদ্জন্ম-ধারার শেষে জীবজন্মের স্তরে স্তরে কত যুগে কত নব নব জীবরূপে যে চলে' এসেছি, এই বিচিত্র অনন্ত যাত্রায় দু'জনে কতবার কত কাছাকাছি এসে পড়েছি। এক বৃক্ষে নীড় বেঁধেছি, এক বনে ঘুরেছি, এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। সেই-সব জন্মের কত জনের সঙ্গে কত জানাশোনার স্মৃতি আজ আমাকে উন্মনা করে' তুলছে। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সেই সহজ সরল মিলনের উদার পথ খুঁজে পাচ্ছি না; সমাজ-অনুশাসন-কণ্টকিত পথে পরিচয়ের দ্বার চারিদিকে রুদ্ধ। এই ঘননীল সবুজ

সাগরের দিকে চেয়ে সূর্য্যের উদার আলোয় বসে' এই কথাই ভাব্‌ছি, জন্মে জন্মে যাদের সঙ্গে কত পরিচয়ের অমৃত পান করে' এসেছি, আজ তাদের সঙ্গে একটু কথা বল্‌তেও সঙ্কুচিত।

এই যে মনে হচ্ছে, এর ত কোন প্রমাণ দিতে পারি না, শুধু মনে হচ্ছে।

দু'জনেই উঠে নৌকা থেকে সরে' ঢেউগুলোর আরও কাছে এগিয়ে গেলুম। নিমেষের জন্য মেয়েটি ফিরে তাকাল, তারপর কেউ আর কারো দিকে চাইছি না।

কোন কাজ নয়, কোন চিন্তা নয়, কোন গল্পও নয়, এ মনের কুঁড়েমি করবার বেলা। শুধু কোন দরদীর পাশাপাশি চুপচাপ বসে' থাকা, আর মাঝে মাঝে ফিস্‌ফাস্‌ দু'চারটি কথা বলা।

পশ্চিম কোণের সাদা মেঘগুলো ইরাণীর চোখের কাজলের মত কালো হয়ে আস্‌ছে। মনটা একটু ভারী হয়ে আস্‌ছে। মানব-জন্ম লাভ করে' যেমন অনেক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতির আনন্দ পেয়েছি, তেমি কত সহজ সরল সুখ হারিয়েছি। এই যে ফেনা হয়ে আলোয় জ্বলছি, ফুল হয়ে ফুটেছি, পাখী হয়ে গেয়েছি, এই আলো জল হাওয়ার স্পর্শের মুক্ত আনন্দের স্বাদ যেন ভুলে গেছ্‌লুম। ঋতুর পর ঋতু ফুলে ফুলে পা মেলে চলে' যায়, আমরা যন্ত্র গড়ি, হিসেব কসি, গ্রন্থ পড়ি, নগর গড়ি, যুদ্ধ করি, সমাজ ভাঙ্গি, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার কথা ভুলে যাই। এ সমুদ্রতীরে কত হারানো জীবনের আনন্দস্মৃতি, জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে গোপন যোগের কথা উদাসী করে' তুল্‌ছে।

দু'টি জগৎ পাশাপাশি চলেছে, মানুষের জগৎ আর প্রকৃতির জগৎ। মানুষ প্রকৃতিকে জয় কর্‌তে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তার প্রেমের রসের সম্পর্ক ঘুচে গেছে। এই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে যোগাযোগের পথ, সেই

গুহাহিত রহস্যময় দ্বার উদ্ঘাটন করে' আবার প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় কর্‌তে ইচ্ছে করে। কোন যবনিকা যেন পড়ে' গেছে, আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার রাস্তাটার সন্ধান কর্‌ছি।

কোন কথা নয়, কোন কাজ নয়, কিছু-না-ভাবার দুপুর। পূর্ব্ব দিগন্তে শুভ্রবলাকার মত ছোট মেঘখানি যেমন নীলজলের ওপর চুপ করে' শুয়ে সূর্য্যালোক পান কর্‌ছে. আর কোন নবদেশের স্বপ্ন দেখ্‌ছে, তেম্নি চুপ করে' সমস্ত মন ছড়িয়ে দেহের পাত্র ভরে' শিরায় শিরায় এই বাতাস আলো পান করা। চোখ দুটো সাগরে তলিয়ে দেওয়া। এই চিররহস্যময় কল্লোল-মুখর সিন্ধুর দিকে চেয়ে আছি, যেন এক তরুণীর মুখ।

মেয়েটিও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, খুব কাছাকাছি। কেউ কারো দিকে চাইছি না।

হে অনন্ত সমুদ্র, আজ এই আষাঢ়ের নবমেঘস্নিগ্ধ দিনে তোমাকে যে আমার সুন্দর লেগেছে, তা কি তোমায় জানান যায় না?

কিন্তু আমার সঙ্গে এ সিন্ধুর যদি কোন মনের যোগ না থাকৃত, তবে কি ঐ বিপুল জলরাশি আমার মনকে এম্নি করে' স্পর্শ কর্‌তে পারত? তবু এর সঙ্গে সেই পরিচয়ের খোলা পথ যেন কতজন্ম রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই ঢেউয়ের ভাষা বুঝ্‌ছি না, তার স্মৃতি মনকে উদাস করে' তুলেছে।

আর মেয়েটির সঙ্গেও ত সমুদ্রের মত পরিচয়ের পথ যেন বন্ধ রয়েছে। তবু জানি দু'জনের মধ্যে মনের যোগ হয়ে গেছে।

মেঘের ছায়া সমুদ্রের জলে লুটিয়ে পড়েছে, মেঘের কালো বেণীর মধ্যে যেখানে অনন্ত পারাবার কোথায় ডুবে গেছে, সেই দিকে চেয়ে মেয়েটি ও আমি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে স্তব্ধ হয়ে' বসে' আছি।

(৭)

সুর্ম্মা-মাখা আঁখির মত কালো আকাশ, তার তলে কিশোরীর নয়নের কালো তারকার মত সমুদ্র, শুধু তটের ধারে ধারে অশ্রু-জলরেখার মত শুভ্র দীপ্ত তরঙ্গের সুদীর্ঘ রেখা টানা, তারপর চোখের কালো কোলের মত বালুতট। খোলা জান্‌লার গরাদে মাথা রেখে সুদূরে চেয়ে বসে' আছি। বাতাস ক্ষেপে উঠেছে, সিরি সিরি বালি ওড়ার শব্দ হচ্ছে, ঢাকাই মস্‌লিনের শাড়ীর মত বালিগুলি উড়ে চলেছে, হাওয়ার গর্জ্জনের সঙ্গে সাগরগর্জ্জন মিলে রুদ্রের ডিমিডিমি ডমরুধ্বনির মত বাজ্‌ছে।

তার কালো চোখের কথা ভাব্‌ছি। মেয়েটি কাল চলে' গেছে।

বোল্‌তার হুলের মত বালিগুলি গায়ে এসে বিঁধ্‌ছে, জান্‌লাটা বন্ধ করে' দিলুম।

বাইরে ঝড় উঠেছে, ঢেউগুলো ক্ষেপে উঠেছে, বিষ্টি আরম্ভ হয়েছে, অন্ধকার ঘরে বসে' আছি, সমস্ত ঘরটা জলহাওয়ার ঝাপ্‌টায় দুল্‌ছে।

কিশোরীর মুখখানি মনে পড়্‌ছে। এই যে ক'দিন একটু দেখা, একটু চাউনি, কাছাকাছি সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে' থাকা, এর মধ্যে তার সঙ্গে যে যোগ সম্বন্ধ হয়েছে তা ঠিক বোঝাবার মত কথা বোধ হয় ভাষায় নেই, আমি ত খুঁজে পাচ্ছি না।

এই সাগরসঙ্গীতছন্দিত সূর্য্যালোক-চন্দ্রালোক-রসধারাস্নিগ্ধ দিন ও রাত্রিগুলির সুনীল বহিরাকাশের ওপর কিশোরীর চিত্তাকাশের আবরণ জড়িয়ে সে কোন স্বপ্নের আকাশ সৃষ্টি করেছিল। তার এই সাগরতীরে থাকাটুকু ছিল এই সিন্ধুগীতের সঙ্গে সেতারের সঙ্গতের মত।

জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে দু'জনে একটু কাছাকাছি এসেছিলুম, আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হয়ত এ জীবনে আর তার সঙ্গে কখনও দেখা হবে না। তার জন্য একটুও দুঃখ হচ্ছে না। হয়ত কিছুদিন পরে আমি তাকে ভুলে যাব, সেও আমায় ভুলে যাবে। কিন্তু মনের যে ঘরে কত ভুলে-যাওয়া বর্ষাসন্ধ্যা, কত হারিয়ে-যাওয়া শরৎপ্রভাতের সুখস্মৃতি জমা হচ্ছে, সে ঘরে দু'জনেরই এ আনন্দক্ষণগুলো জমা হয়ে থাক্‌বে, হারাবে না। কোন ফাগুনসন্ধ্যায় দখিন হাওয়ায়, কোন বর্ষামুখর রাতে অন্তর অজানা কারণে উদাস হয়ে উঠ্‌বে, এই ভুলে-যাওয়া সুখক্ষণগুলি কোনদিন কাজের মধ্যে অতর্কিতে ব্যথা দেবে, তা জান্‌বও না।

তাকে শুধু আর-একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। তাকে দেখেছি, পৃথিবী যেন সবুজ বসন পরে' কিশোরী সেজে সাগরতীরে বসেছে, আর-একবার তাকে দেখি পট্টবস্ত্র-পরিহিতা চন্দনচর্চিতভালে কল্যাণী নববধূরূপে। বিবাহসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে দেখ্‌তে চাই না, রাজপথে এম্নি অতর্কিতে চতুর্দ্দোলার ফাঁক দিয়ে, হর্ষশঙ্কাকম্পিত লজ্জারুণ নববধূর মুখ।

জান্‌লা খুলে সাগরের দিকে চেয়ে আছি। ঝড় থেমেছে, ভিজে বালির গন্ধে ভরা বাতাস বইছে, মেঘদল বকের দলের মত উড়ে চলেছে। মেঘ হতে ঝরা একটু আলো বালির ওপর ঝিকিমিকি কর্‌ছে।

সন্ধ্যা গভীর হয়ে আস্‌ছে, আকাশ অন্ধকার করে' আবার বিষ্টি পড়্‌ছে।

"ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বস্‌ব আমি একা,

তুমি গাবে বসে' ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।
ফুরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে সুরু,
উঠ্‌বে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।"

(৮)

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চতুর্থীর চাঁদ মাঝগগনে ঢলে' পড়েছে। চুপে চুপে উঠে দরজা খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে বালির ওপর পা টিপে টিপে চল্লুম সাগরের অভিসারে। কোন্-সুখস্বপ্নময় চোখে ঘুমন্ত পৃথিবীকে দোলাতে দোলাতে সিন্ধু গান গাচ্ছে।

ঢেউগুলির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, একটি ঢেউ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কাপড় ভিজিয়ে দিল।

হে চিরসুন্দরী অনাদি আদিজননী, আজ তোমার স্নিগ্ধকোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' অতল কালো স্নেহে ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে ; ইচ্ছে করছে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিরাট জঠরে সঙ্গীতচ্ছন্দে নৃত্য-লীলায় যে আনন্দ-কম্পন অনুভব করেছি, সে আনন্দ আবার দেহের শিরায় শিরায় তেম্নি করে' অনুভব করি, আবার তেম্‌নি তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে আলোকে ঝলমল করে' ফেনপুঞ্জে শুভ্রপুষ্পের মত ফুটে শিউরে নিমেষে ঝরে' পড়ে' নৃত্যপাগল হয়ে তোমার অনন্তদেহ বেষ্টন করে' এই নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা হতে সূর্য্যালোক চন্দ্রালোক পান করি, নব নব দ্বীপ গড়ি ভাঙ্গি, নব নব দেশ মহাদেশের তটে তটে কখনও প্রলয়মূর্ত্তিতে ভেঙ্গে পড়ে'

সব চূর্ণবিচূর্ণ করে' তোমার অতলে তলিয়ে দি, কখনও তীরে তীরে মাতার কল্যাণহস্তের মত স্পর্শ করে' শান্তির দোলায় দোলাই; ইচ্ছে করছে, এই তোমার বিরাট দেহে মিশে গিয়ে মানবসভ্যতাপ্রপীড়িত যুদ্ধ-দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মাটির পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপুল অট্টহাসে রুদ্রের পিনাকধ্বনির তালে তালে মহাপ্লাবনে লুটিয়ে পড়ে' নিমেষে তোমার বিরাট জঠরে এ পৃথিবীকে ডুবিয়ে মিশিয়ে আবার নূতন পৃথিবী গড়ে' তুলি, নব মানব সৃষ্টি করি, মানব-ইতিহাসের প্রেমশান্তির পর্ব্ব খুলে দি।

পশ্চিমের কালো মেঘে চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে, ঢেউগুলো আগুনের শিখার মত কাঁপছে।

কিশোরীর চিররহস্যময় কালো চোখের মত সিন্ধু চেয়ে রয়েছে।

অতিথি

অতিথি

—:•:—

গলির মোড়ের চায়ের দোকানটিতে প্রতিদিন সকালে যাহারা চা খাইতে আসে সকলেই প্রায় আসিয়া জুটিয়াছে, একদল চা পান শেষ করিয়া একখানি খবরের কাগজের উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে, আর একদল এত নিবিষ্টমনে চা খাইতেছে যে, একটি অপরিচিত আগন্তুক কখন যে দোকানের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

আগন্তুকটি অবশ্য অতি ধীরে নিঃশব্দে দোকানে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার মৃদু স্নিগ্ধস্বরে সকলে একটু চমকিয়া উঠিল,—মশাই, তিন নম্বর বাড়ীটা কোথায়, বল্‌তে পারেন?

তিন নম্বর বাড়ী! পাড়ায় এই বাড়ীটি সবাইয়ের বিশেষরূপে পরিচিত। এই বাড়ীটির নাম হইতেই কেহ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া মুচকাইয়া হাসিল, কেহ চা পান করিতে করিতে ঠোঁট কাঁপাইয়া হাসিল, কেহ চা'টুকু নিঃশেষ করিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিল—কিন্তু যাহারা নব আগন্তুকের দিকে চাহিল, তাহারা কেহ হাসিল না, বিস্মিত বিমুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুকটি একটু অগ্রসর হইয়া হাতের মোটা বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়া চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাজসজ্জা, দাঁড়াইবার ভঙ্গী হঠাৎ দেখিলে হাসি পায় বটে, কিন্তু তাহার রহস্যময় শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলে মুখ গম্ভীর হইয়া যায়। পরণে ময়ুরকণ্ঠী রংএর সিল্কের লুঙ্গি, তাহার ওপর জরির কাজ করা লাল সাটিনের কাবুলী জামা, পায়ে হল্‌দে পেটেণ্ট চামড়ার

ঘুণ্টি দেওয়া জুতা; মাথার মাঝ দিয়া সিঁথির দুই পাশে বড় কালো কোঁকড়ান চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার ওপর এক ঘন সবুজ সিল্কের রুমাল কায়দা করিয়া জড়ান; হঠাৎ দেখিলে বর্ম্মাবাসী বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু সুন্দর মুখটির দিকে চাহিলে, সে ভুল হয় না; লম্বা সরু নাকটি খাঁড়ার মত উন্নত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু বেশ উঁচু, মুখ হইতে কি একটা রহস্যময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে; সেই আগুনের আভার ওপর ভ্রমরের হুলের মত কালো ফুলের পাঁপড়ির মত কমনীয় ছোট দাড়ি ও গোঁফ ধোঁয়ার হাল্কা কুণ্ডলীর মত ঘিরিয়া। এরকম দাড়ি গোঁফ রাখিলে, ওরকম সাজ সজ্জা করিলে আর কাহাকেও অতি অদ্ভুত হাস্যকর দেখাইত, কিন্তু এই সাজেতেই যেন এই আগন্তুককে অতি সুন্দর দেখাইতেছে, আগুনের ফোয়ারার মত তাহার লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, তাহার কাঁচা সোনার মত দেহের রং, তাহার মায়াময় মুখখানি—সব সুন্দর দেখাইতেছে। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ-দুইটি, কখনও হীরার মত জ্বলিয়া ওঠে, কখনও নীলার মত স্নিগ্ধ হয়; শিশুর মত সরল, তরুণীর মত রহস্যময়, বৃদ্ধের মত উদাস এই জ্যোতির্ম্ময় চোখ দু'টি দিয়া যাহার দিকে চায় তাহাকে যেন বিদ্যুতের মতন স্পর্শ করে।

যে দাড়ি-গোঁফকামান টাক-ওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই পাড়ার চায়ের আড্ডার দলপতি বা সভাপতি বলিয়া আপনাকে মনে করেন, তিনি কাগজে চোখ রাখিয়া জার্ম্মান-ফরাসী রাজনীতি, সেয়ার মার্কেট ইত্যাদি সম্বন্ধে কি নতুন মত প্রকাশ করিবেন ভাবিতেছিলেন, সহসা সবাই এমন স্তব্ধ হইয়া গেল দেখিয়া অবাক হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এ আড্ডায় হাস্যরসিক ব্যঙ্গ করিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহার নাম আছে, এই অদ্ভুত আগন্তুককে দেখিয়া তিনি কি পরিহাসের কথা বলিবেন, তাহা শুনিতে সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আগন্তুকটি

দলপতি মহাশয়ের দিকে নির্ম্মলোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া বলিল, আমি তিন নম্বর বাড়ীটা খুঁজ্‌ছি। দলপতি মহাশয়ের মুখে একটু ব্যঙ্গহাসি খেলিয়া গেল, অন্য কেহ হইলে তিনি বলিতেন, আরে ভাই তিন নম্বরে যাবে! যেখানে নয়টা গলার কনসার্ট দিনরাত বাজ্‌ছে, যেখানে—

কিন্তু আগন্তুকের উজ্জ্বল চোখ দু'টি তাঁহার চোখের উপর আসিয়া পড়াতে তিনি একটু চুপ করিয়া অতি শান্তভদ্রভাবে বলিলেন, তিন নম্বর বাড়ী মশাই, এই গলি দিয়ে বরাবর যান, তারপর গলিটা যেখানে বেঁকেছে সেইখানেই দেখ্‌তে পাবেন, লাল রংএর বাড়ী, তবে লাল রংটা কালো হয়ে গেছে—

ধন্যবাদ মশাই, নমস্কার, বলিয়া আগন্তুকটি মাথা একটু নত করিয়া অতি মৃদু হাসিল। তাহার সেই মৃদু হাসির দিকে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিল—নিবিড় বনছায়ায় ঢাকা স্নিগ্ধ রূপালি জলধারার মত তাহার কালো গোঁফের ফাঁক দিয়া সুন্দর হাসিটি নিমেষে ঝলসিয়া গেল। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দোকান হইতে বাহির হইয়া সে তিন নম্বরের দিকে চলিল। সকলে তাহার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গীটির দিকে চাহিয়া রহিল। নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন, নানা পরিহাসের কথা উঠিতে লাগিল, কিন্তু কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া উঠিতে পারিল না।

লোকটা কি খোঁড়া, অমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কেন! পেছন থেকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন বছর চল্লিশ বয়স, কিন্তু মুখ দেখ্‌লে ত চব্বিশের বেশী বলে মনে হয় না। মুখখানা কচি বটে, কিন্তু রং মাখা নিশ্চয় আছে, অত অল্প বয়স নয় লোকটার। বাপু তিন নম্বরে যাচ্ছে, সুবিধে করে উঠ্‌তে পার্‌বে না ওই মিউ মিউ গলা নিয়ে, সেখানে ঢাক ঢোল নিয়ে যাও পাত্তা পাবে। তিন নম্বরে ও কেন যাচ্ছে? নিশ্চয়ই সেই বেহায়া মেয়েটার কাছে, সেও দেখি এম্নি রং চং এর সাজ করে,—

জম্‌বে ভাল। চায়ের দোকানে ঢুকে লোকটা চা না খেয়ে চলে গেল। দাদা, ও বাড়ীতে এক কাপ চাও জুট্‌বে না, বলে—

নানা জনের মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু সকলে নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিল। দলপতি মহাশয়ও নীরব, তিনি কাগজ সরাইয়া ভাবিতেছিলেন, লোকটাকে এম্নি দেখলে মনে হয় একটা সৌখীন সং, কিন্তু লোকটা বোধ হয় সাধারণ নয়, কি চোখ! বলিয়া উঠিলেন, ওহে আজকালকার ছোকরারা, তোমাদের ত দাড়ি গোঁফ না কামালে—দেখত ওই ভদ্রলোকটি—দাড়িগোঁফ রেখে কি সুন্দর মুখখানা —কিন্তু কোথাও একটু—বলিয়া ঈষৎ পরিহাসের হাসি হাসিলেন।

আর সকলে সে হাসিতে বিশেষ যোগ দিল না। আগন্তুকটি সকলের মনে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপেই রহিল, তাহার সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা হইল না। সেদিন চায়ের আড্ডা আর জমিল না, পরনিন্দা পরচর্চ্চা বাজে তর্ক করিতে কাহারও ভাল লাগিল না, চা পান শেষ হইতেই সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তিন নম্বর বাড়ীটি গলির কোণে যেমন বাঁকিয়ে গিয়েছে, এ বাড়ীর লোকগুলিও তেমনি বাঁকা, কেহ সরলভাবে ভাবে না, সোজা কথা বলে না। বাড়ীর সাম্‌নের খাবারের দোকানে খাবারওয়ালা যখন গরম গরম জিলিপি ভাজে সে তখন তিন নম্বর বাড়ীটির দিকে চাহিয়া হাসে। এ বাড়ীর লোকগুলির মনগুলি ঠিক এই রকম জিলিপির প্যাঁচ—তাদের মেজাজ এম্নি গরম হইয়াই আছে। পেঁচার মত সবসময় মুখ ভারি। বাড়ীটি যে চুপচাপ শান্তিতে থাকিবে, এ কাহারও সহ্য হয় না, গোলমাল চেঁচামেচি ঝগড়া লাগিয়াই আছে।

উকিল কর্ত্তাটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশ পসার—বেশ রোজগার

করেন। মাথায় একটু টাক পড়িয়াছে, কতকগুলি চুল পাকিয়াছে, গম্ভীর পাকা মুখ যেন নির্ম্মম আইনের মায়াময় বিচারের প্রতীক, টাকা রোজগার লইয়াই আছেন, আপন সংসারের কিছুই দেখেন না। কিন্তু হঠাৎ হয়ত একদিন দেখিলেন, চাকর মস্তবড় ঝুড়িতে বাজার করিয়া ফিরিতেছে, নথি ফেলিয়া চাকরকে ডাকিয়া বাজারের তরকারি মাছ সব পরীক্ষা করিতে সুরু করিলেন, এত বাজার! তাহার টাকা সাতভূতে মিলিয়া ওড়াইতেছে! ঠিক, কাল রাতে পাতে পাঁচ রকম তরকারি দেওয়া হইয়াছিল, দুই রকম রাঁধিলেই হইত। গিন্নির ডাক পড়িল, বাজারের হিসাবের খাতা আনা হইল, গায়ের-রক্ত-জল-করা টাকা লইয়া সকলে মিলিয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছে অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তা তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, গলাবাজি হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

গিন্নিটি কুঁড়ে, ঢিলে রকমের, এম্নি সাধাসিধে, কিন্তু সংসারের ঘুরপাকে মাঝে মাঝে বড় ঘোরাল হইয়া ওঠেন। শরীর স্থূল বলিয়া নিজে খাটিতে পারেন না, ঝি চাকর বোন জেঠাই সবাইয়ের ওপর তম্বি করিয়া বেড়ান। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার বলিয়া তাঁহার প্রধান গর্ব্ব, নিজে দাঁড়াইয়া কাজ না দেখিলে কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় না, তাই মোছা ঘর আবার মোছাইতে, মাজা কড়াই আবার মাজাইতে, ধোওয়া কাপড় জামা আবার ধোয়াইতে ঝি চাকরের সঙ্গে বকাবকি তাঁহার লাগিয়াই আছে।

আর জেঠাইমা যখন তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ লইয়া যোগ দেন তখনই ঝগড়া ঠিক জমিয়া ওঠে, তিন নম্বরের চারিদিকের বাড়ীগুলির জানালা সব খুলিয়া যায়। তাঁহার গ্রামে সবচেয়ে কুঁদুলে বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি ছিল একথা তিনি প্রতিদিন পাড়ার লোকদের স্মরণ করাইয়া দিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, কর্ত্তা যখন বালক, তিনি তাঁহার বৃদ্ধ

রোগগ্রস্ত স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। তিন নম্বর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও ইহসংসারের সুখদুঃখের মায়াজাল কাটিয়া স্বামী শীঘ্রই খসিয়া পড়িলেন, কিন্তু জেঠাইমা রহিয়া গেলেন, এখনও আটকাইয়া আছেন!

তিন নম্বরে কেবল ঝগড়া মন কসাকসি নয়, হাসাহাসিও হয়, কিন্তু সবাইয়ের সম্মুখে নয়—অন্তরালে, নিভৃতে দু'জনে। সে হাসি আনন্দের নয়,—পরিহাসের, ব্যঙ্গের। কর্ত্তার ভাইঝির ঠোঁট দুটি সবসময়ই পানে রাঙা, তাহার গালদু'টি সবসময়ই রঙে লাল, আর তাহার মুখে সবসময়ই পরিহাসের চাপা হাসি। এই সৌখিন যুবতী ভাইঝিটি কয়েকবছর পূর্ব্বে কোন জেলার সহর হইতে কর্ত্তাকে অতি করুণভাবে লেখে, তাহার রুগ্ন স্বামীকে কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা না করাইলে তাহার ভাগ্যে বৈধব্যযন্ত্রণা লেখা আছে। কলিকাতায় আসিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, এইমর্ম্মে কর্ত্তার চিঠি পাইলে, ভাইঝিটি কেবল তাহার চিররুগ্ন স্বামীকে নয়, তার সঙ্গে তাহার সুন্দর খাট, ড্রেসিং টেবিল, কাপড়ের দুই আলমারী, বইয়ের তিন আলমারী, কার্পেট, বাঁধানছবি সব লইয়া এই তিন নম্বরে আসিয়া উঠিল। ঘর সাজান গোছান না থাকিলে তাহার স্বামীর রোগ বাড়িবে, সে ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া না থাকিলে তাহার স্বামীর মন খারাপ হয়, এই বইগুলি ছবিগুলি না দেখিলে তাহার স্বামী বাঁচিতে পারেন না। স্বামীটি বয়সে যুবক কিন্তু চিররুগ্ন। এক টাইফয়েডের পর শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, রোগা শরীরটিতে করুণ সুন্দর আভা মাখান; সে বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, ইজি চেয়ারে শুইয়া কবিতা লেখে। কর্ত্তা দু'চার জায়গায় তাহার জন্য চাকরীর যোগাড় করিয়াছিলেন কিন্তু ভাইঝিটি চাকরী করিতে দেয় নাই। তাহার স্বামীর বিশ্রামের দরকার।

এ ভাঙা শরীরে আফিসের কাজ করিলে এক বছরও দেখিতে হইবে না। তাহার চিররুগ্ন স্বামীকে লইয়া ভাইঝিটি বহুদিন পূর্ব্বে তাহার কাকার বাড়ী অতিথিরূপে উঠিয়াছিল, এখনও আপনাকে অতিথি ভাবি...ই আছে। সে সাজে, স্বামীর সঙ্গে গল্প করে, মুচকাইয়া হাসে, ভাল খাইতে না দিলে রাগ করে. সংসারের কোন কাজ করে না।

এ বাড়ীর শুধু একটি মেয়ের গলা পাড়ার কেহ কোন দিন শোনে নাই। গিন্নির যে দূর সম্পর্কীয়া তরুণী বিধবা বোনটি এ সংসারের সকল কাজ করে, তাহার ওপর সকলেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হয় কিন্তু কেহ বাণ ফিরিয়া পায় না। তাহার প্রকৃতি অনেকটা রবারের মত বলা যাইতে পারে, তাহাকে আঘাত কর, নিঃশব্দে সে আঘাত গ্রহণ করিবে; বাড়ীর আর কাহারও প্রতি কিন্তু একটু কথার ঢিল ছুঁড়িলেই তাহারা কাঁচের মত ঝন্ ঝন্ করিয়া ওঠে। সে অনাথিনী, গিন্নি তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, এই কথাটি গিন্নি প্রতিদিন অন্ততঃ একবার তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। নতমুখে নিঃশব্দে সে সংসারের সকল কাজ করিয়া যায়। আপনাকে নীরবে দগ্ধ করিয়া সে সংসারের সকল বিষ আপনার মধ্যে জীর্ণ করে, চারিদিকে কথার আগুন জ্বালাইয়া ছড়ায় না। এ বাড়ীতে প্রথম যখন সে আসিয়াছিল, সেই পূর্ণিমার চাঁদের মত টলটল রূপ এখন তাহার নাই, এ বাড়ীর ঝগড়ার আগুণে সে রূপ ঝলসিয়া গিয়াছে। সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অতন্ত তীক্ষ্ণ দু'চারিটি কথা বলে; সে কথাগুলি অত্যন্ত কটু, ভয়ঙ্কর লাগে, কেন না সেগুলি সত্য। সে এখন শুচিবাইগ্রস্তা, কটুভাষিণী, শীর্ণা বিধবা। তাহার বয়স? বিধবার আবার বয়স কি? বয়সে সে ঐ ভাইঝির ছোট হইতে পারে, কিন্তু সে জেঠাইমার সমবয়সী।

অন্ততঃ জেঠাইমা তাহাকে তাঁহার সমকক্ষ সমবয়সী বলিয়াই

ভাবিতেন, তাই সকালে তাহার সহিত ঝগড়াটা বেশ ভাল করিয়াই জমাইয়াছিলেন। ঝগড়ার কারণটা সব সময়ে বলা শক্ত, অনেক সময় অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণেই ঝগড়া বাঁধিয়া ওঠে। সকালে ঝগড়াটা এইরূপ ভাবে সুরু হইয়াছিল—

জেঠাইমা চালের হাঁড়িতে জল বসাইয়া আসিয়া বলিলেন—ওগো, চালটা কৈ দাও না, কয়লা যে জ্বলে ছাই হয়ে গেল,—গিন্নি এখন দেখ্‌তে পেলেই বল্‌বে আময়দা কয়লা, কিন্‌তে ত হয় না, খুব পোড়াও—

—ওই নাও না জেঠাইমা চালটা হাতায় মেপে, আমি ঝোলের কুটনো কুট্‌ছি।

—না বাপু আমি কেন ভাঁড়ারে হাত দিতে যাব?

—হাত দিলেই ত তুমি চোর হবে না—

—চোর! আমি চোর হলুম, ওরে—

তারপর জেঠাইমার গলাবাজি সুরু হইল। অনেকক্ষণ চেঁচাইয়া শ্রান্ত হইয়া তিনি উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন, আজ তিনি রান্না করিবেন না। গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন, ভাইঝি হাতে একটি চায়ের পেয়ালা লইয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, অর্থাৎ সে ঝগড়া দেখিতে আসে নাই, চায়ের জন্য দুধ লইতে আসিয়াছে। তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া জেঠাইমা বলিলেন,—আচ্ছা তুই বল মা, তুই বল—

সে মুখের হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—অত বানিয়ে বানিয়ে বল্‌বেন না।

জেঠাইমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বানিয়ে! আমি মিথ্যে কথা বলছি! আমি যদি মি—মি—মি—বলে থাকি আমার মাথা খাই—যে মিথ্যে কথা বলবে তার গ—গতরে আগুন লাগুক, চোখে আগুন লাগুক—ভ—ভ—ভ-গবান আছেন।

জেঠাইমার বেশী রাগ হইলে তিনি একটু তোত্‌লা হন এবং সব শেষে ভগবানের সুবিচার প্রার্থনা করেন।

গিন্নি বলিয়া উঠিলেন—ভগবান ত আছেন, কিন্তু জেঠাইমা কাল একাদশী আর আজ হাঁড়ি নামিয়ে যে যাচ্ছ! নিজে খাবে না আর আমার ছোট বোনটাকেও খেতে দেবে না?

—ঘাট হয়েছে মা, আমার ঘাট হয়েছে, আমি বুড়ী নাকে কানে খৎ দিচ্ছি—যদি আর—ওরে আমার মাধবরে তুই যদি আজ বেঁচে থাকতিস্ তবে কি তোর মা'র আজ এ দশা হোতরে বাপ্—

—দেখ জেঠাই মা সকাল বেলায় যদি মড়া কান্না সুরু কর—গেরস্তর বাড়ীর অকল্যাণ কোরো না—চেঁচামেচি ভাল লাগে না আমার—

ভাল ত লাগবেই না মা, এ সংসার কি আর ভাল জায়গা, বলিতে বলিতে তিনি উঠান পার হইয়া তাঁহার ঘরের দিকে চলিলেন। উঠানের কোণে দরজার দিকে চোখ পড়াতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—কেরে হতভাগা মিন্‌সে বাড়ীর—

কিন্তু আগন্তুকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আগন্তুকটি মাথার নীল রুমালটি খুলিয়া মুখ মুছিয়া বলিল—কি জেঠাই মা, চিন্‌তে পার?

বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে জেঠাইমা বলিলেন,—পারি বৈ কি বাবা!

মৃদু হাসিয়া আগন্তুকটি বলিল—নম্বরটা দরজায় লেখা দেখছিলুম মা, কিন্তু তোমার গলা শুনে ঢুকে পড়লুম, কি তোমার গলা জেঠাইমা—সেই কত বছর আগে শুনেছি এখনও ঠিক তেমি আছে। কি বৌদি মনে আছে? গিন্নি ম্লান হাসিয়া বলিলেন—আছে বৈ

কি ভাই। আগন্তুক রহস্যময় চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিল—দেখ বৌদি বেশ জমিয়েছে সকাল বেলাটা, ঠিক এম্নি সকাল বেলার একটা গোলমাল হৈ চৈ আমার মনে পড়ছে—উঠানের ওই কোণে মাছের একটা ছোট পাহাড় হয়েছে, মাছ কুটতে ধুতে ঝিরা হৈ চৈ লাগিয়েছে, আর জেঠাইমা একটা লাল পাড় তসরের শাড়ী পরে ঝিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলাবাজি করছেন—সে তোমার বৌভাতের দিন—তুমি নতুন বৌ, ঠিক ওই জায়গাটায় একটা লাল চেলি পরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, বুকটা দুর দুর করছে—এম্নি হট্টগোলের মধ্যে ঘর করতে হবে—ঠিক এম্নি সুন্দর সকালবেলাটা—

স্মৃতিস্বপ্নবিজড়িত আনন্দদীপ্ত চক্ষে আগন্তুক একবার গিন্নির দিকে একবার জেঠাইমার দিকে চাহিয়া মধুর হাসিল। তাহার উপরের মাড়ীর সামনের দাঁতটা আধখানা ভাঙা, সেই মুক্তার মত ঝকঝকে সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়া লাল ঠোঁটের তট ভাঙ্গিয়া কালো গোঁফের রেখার পাশ দিয়া সে হাসি স্নিগ্ধ রূপালি জলধারার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গিন্নির বিধবা বোন দরজার আড়াল হইতে বিমুগ্ধনেত্রে এই হাসিভরা মুখ দেখিতেছিল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই আগন্তুকের চোখের চাওয়ায় জেঠাইমার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখখানি নিমেষের জন্য যেন পূর্ণপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত যুবতীর মুখ হইয়া গেল, নিমেষের জন্য গিন্নির রুক্ষ শীর্ণ মুখখানি তরুণীর মুখের মত কমনীয় সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর হইয়া উঠিল। সুখস্মৃতির মায়ামন্ত্র স্পর্শে গিন্নি নিমেষের জন্য অনুভব করিলেন, তিনি সদ্যবিবাহিতা নববধূ, নববধূর প্রেমস্বপ্ন আশা আনন্দে তাঁহার মুখ একটু রাঙা হইয়া উঠিল। জেঠাইমার মনে হইল, তিনি কলহপ্রিয়া কুটিলা স্বার্থপরায়ণা প্রৌঢ়া বিধবা নন,

তিনি মঙ্গলময়ী কল্যাণকর্ম্মরতা গৃহিণী। প্রভাতের আলো হইলে ফুলের কুঁড়ি যখন পাপড়ি মেলিয়া ফুটিয়া ওঠে, তাহার পাশের ফোটাফুলগুলি আলোর স্পর্শে যেমন একটু শিহরিয়া ওঠে তেমনি তাঁহাদের মন একটু শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জেঠাইমা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—বাবার আমার এতও মনে থাকে!

কাঁসরের মত তাঁহার গলায় এ স্নিগ্ধসুর শুনিলে পাড়ার সবাই অবাক মানিত।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—মনে থাকে বলেই ত এলুম, কাল বিকেলেই আসছিলুম, মেসের ঘরটা পরিষ্কার করতে রাত হয়ে গেল।

এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। গিন্নি হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিলেন,— মেসে তোমার থাকা হবে না ভাই, মেসে ওঠা তোমার কিছুতেই হবে না—আমি লোক পাঠিয়ে জিনিষপত্তর আনছি—'

—না, বৌদি তোমাদের—

—কিছু অসুবিধে নয়, আমার অতিথি হয়েই না হয় রইলে; না, মেসে থাকা হবে না—

জেঠাইমা বলিলেন—সত্যিই ত আমরা এখানে আছি, আর তুই কোথা পড়ে থাকবি!

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—তোমারই হাঙ্গাম বাড়বে জেঠাইমা, জানত আমি নিরামিষ খাই।

—বাবা, তোমাকে রেঁধে আবার খাওয়াব এ আমার অনেক দিনের সাধ ছিল, ঈশ্বর আছেন, না, বৌমা, ওকে ছেড় না।

আগন্তুককে গিন্নি আপনার ঘরে লইয়া গেলেন। জেঠাইমা হাসিমুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া উনানের ওপর ভাতের হাড়ি বসাইলেন। ফুলের

গন্ধ শুঁকিয়া যেমন পাঁক ঘাটিতে ইচ্ছা করে না তেমনি সমস্ত সকাল কাহারও ঝগড়া করিতে ইচ্ছা হইল না।

সেদিন দু'পুরে ভাইঝির ঘরে একটি ছোট সভা বসিয়াছে। প্রতিদিনই স্বামী-স্ত্রীতে দুপুরে সভা বসে, স্ত্রী ইজিচেয়ারে শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে তিন নম্বরের সংসারের ও পাড়ার অন্য সব বাড়ীর রিপোর্ট দেয়—কাহার সহিত কাহার ঝগড়া কি জন্য হইল, কর্ত্তার মেজাজটা কিরূপ, জেঠাইমা ঝির হাতে লুকাইয়া তাঁহার দাদার বাড়ী কি পাঠাইয়াছেন, ওবাড়ীর নতুন বৌ কেমন দেখিতে ইত্যাদি। স্বামী বিছানায় শুইয়া তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া ইংরাজী ম্যাগাজিন বা নভেলের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শোনে। আজ কিন্তু তাহাদের ঘরে গিন্নি আসিয়া বসিয়াছেন। কাকিমার হঠাৎ ঘরে পদার্পণ ভাইঝির ভাল ঠেকিতেছিল না, নিশ্চয় কোন মৎলব আছে, এ আগমনের সঙ্গে নতুন অতিথিটির কোন যোগ আছে। যোগ অবশ্য ছিল। সেই ত এই সংসারতাপক্লিষ্ট আনন্দহীন রুক্ষ কাকিমার মনকে নবযৌবনের হাস্যময়ী সেবিকা কাকিমার স্বপ্নময় মনের রংএ রাঙাইয়া দিয়াছে, আজ তাই রুগ্ন ভাইঝি-জামাইকে দেখিতে আসা কাকিমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে।

ভাইঝি একটু পরিহাসের সুরে বলিল—যা বল কাকিমা, তোমার এই নতুন ভাইটি যা ষ্টাইলিস্—চালিয়াৎ—

স্বামী নভেল হইতে মুখ তুলিয়া বাঁকা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল, অর্থাৎ বলিল—তোমার চেয়ে নয়।

কাকিমা বলিলেন—হাঁ, চিরকালই ও একটু সৌখীন।

ব্যঙ্গ হাসিয়া ভাইঝি বলিল—ওকে সৌখীন বলে না, সং বলে—

স্বামী মুখ ঘুরাইয়া ব্যঙ্গদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল, অর্থাৎ সং যদি কেউ থাকে ত তুমি, দিনরাত সাজ, সাজ—

স্ত্রীও স্বামীর দিকে ব্যঙ্গদীপ্ত চোখে চাহিয়া রাঙা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল, অর্থাৎ, তবু যদি নিজে রোজগার করে সাজাতে, আমি সাজি আমার বাবার টাকায়, কাকার টাকায়।

—আচ্ছা কাকিমা, ও কি একটু খোঁড়া?

—কিন্তু কি সুন্দর মুখখানা বল্‌ত, কি রং—

—কিন্তু আজকালকার ছেলে হয়ে কি বিচ্ছিরি দাড়ি রেখেছে, তবে চোখটা সুন্দর বটে—উনি কাকার কি রকম ভাই?

—কিরকম দূর সম্পর্কের, অনেকদিন আগে আমাদের বাড়ী কয়েক বছর ছিল।

অতিথিটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—বা বৌদি, আমি সমস্ত বাড়ী তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি জামাইয়ের ঘরে বসে—আরে ও কে পালাচ্ছে!

ভাইঝির আর পালান হইল না, সে মুগ্ধনেত্রে এ মূর্ত্তিমান যৌবনের মত অতিথির দিকে চাহিল, অতিথির সাজ বদল হইয়াছে, সে গেরুয়া রংএর কাবুলিওয়ালাদের মত পাজামা ও পাঞ্জাবী পরিয়াছে, পায় কিছু নাই, কি সুন্দর পা দুখানি।

গিন্নি বলিলেন—এই আমার ভাইঝি, আর ওই জামাই।

—এই তোমার জামাই— আপনাকে চিনি চিনি—আরে তুমি!—এর সঙ্গে পড়েছি যে।

জামাইবাবুর দুই হাত ধরিয়া অতিথিটি তাহাকে এক ঝাঁকুনি দিল।

—আরে তুমি! কর কি, কর কি ভাই, বুকে লাগবে—

—বুকে লাগবে! বাপু তোমার সে বুকে রাখার গল্প ভুলে গেছ?

জান বৌদি ছোটবেলায় ও কিরকম নাদুস নুদুস মোটা ছিল। আমাদের ক্লাসে ওর চেয়ে আর একটি ছেলে মোটা ছিল, তাই ওকে বলা হত মোটা দি সেকেণ্ড। একদিন ওকে বলা হোলো, দেখ, মোটা দি সেকেণ্ড, মোটা দি ফার্ষ্টকে যদি তোমার বুকে ছ'মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখে দিতে পার, একসের রসগোল্লা খাওয়াব—তা ও রাখ্‌লে—

স্ত্রী স্বামীর দিকে স্নিগ্ধ নয়নে তাকাইয়া বলিল—আর এক সের রসগোল্লা খেলে ?

—না, সেটা আমরা ভাগাভাগি করে খেলুম—কিহে মনে পড়ে ? বৌদি তোমার খুকী বুঝি কাঁদ্‌ছে ?

—হাঁ ভাই, আমি যাই।

—না, আমিই যাচ্ছি, কাকিমা, তুমি বস।

একটু বিস্মিত নয়নে ভাইঝির দিকে চাহিয়া কাকিমা বলিলেন—না, মা, আমিই যাচ্ছি। ব্যাপারটা অবশ্য দু'জনের কাছেই বিস্ময়ের ; এ বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদিলে, তাহাদের কাঁদিতে দেওয়াই দস্তুর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারা চুপ করিবে। কাঁদিলে কেহই ছুটিয়া যায় না।

গিন্নি চলিয়া গেলে অতিথি তাহার বন্ধুর হাতখানি টানিয়া জড়াইয়া বলিল—কি অসুখ তোমার ভাই ?

স্ত্রী স্বামীর দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিল, এই প্রশ্নটিকে সে ভয় করিত, এবার বুঝি স্বামী তাহার রোগের দীর্ঘ ইতিহাস বলিতে সুরু করে—টাইফয়েড কবে হইয়াছিল. কবে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, কখন হাঁপানির টান, কোথায় কখন অম্লশূল হয়, কোন ডাক্তার দেখিয়াছে, কি চিকিৎসা হইয়াছে, ইত্যাদি। অতিথির সুডৌল সুন্দর দৃঢ় হাতের পাশে স্বামীর শীর্ণ হাতটির দিকে সে চাহিয়া রহিল।

বন্ধুর উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী উত্তর দিল— অসুখ আর কি, এই general weakness—

পিঠ চাপড়াইয়া অতিথি জয়ধ্বনির মত বলিয়া উঠিল—তাই বল, ওত কোথাও চেঞ্জে গেলেই সেরে যাবে—আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝছি কোন অসুখ নেই—দেখ একটা কাজে লেগে যাও—ওঃ, কলেজে তোমায় কি খাটাতুম—এসিস্‌টাণ্ট সেক্রেটারী করে যত ফরমাজ—

স্নিগ্ধ উৎসুখ চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিতে স্ত্রীর চোখ অতিথির চোখের উপর আসিয়া পড়িল, সেই চোখের ভেতর সে যেন তাহার তরুণ স্বাস্থ্যবান কর্ম্মরত স্বামীকে খুঁজিয়া পাইল, কি সুন্দর স্বামীর ছবি ভাসিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা আপনি মুখ দেখে বুঝতে পারিলেন ওঁর অসুখ নেই—

—হাঁ, আমি মুখ দেখে বুঝতে পারছি, ওর কোন কাজে লাগা দরকার—

—আচ্ছা, আমার মুখ দেখে কি বুঝছেন?

অতিথিটি মৃদু হাসিয়া বলিল—দেখ বন্ধু, তোমার স্ত্রীটি একটি রত্ন।

রত্ন! ব্যঙ্গ! ভ্রূকুটি করিয়া স্ত্রী অতিথির দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার সরল, শান্ত চোখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল, অতিথি সত্যই পরিহাস করিতেছে না। ওই জ্বলজ্বল চোখের ভেতর সে তাহার ভিতরকার কোন গোপন সত্যিকার 'আমি'র সন্ধান পাইল, প্রতিক্ষণ আয়নায় তাহার সাজসজ্জার যে ছবি দেখে সে রূপ নয়, ওই চোখে যে ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে সেই তাহার সত্যিকার রূপ।

পরিহাসের সুরে স্বামী বলিল—হাঁ, রত্নই বটে। কিন্তু অতিথির মুখের দিকে চাহিয়া সেও বিস্মিত হইল। অতিথি বলিতে লাগিল—দেখ কি সুন্দর তোমার ঘরখানি সাজান, এ ঠিক লক্ষ্মীর কল্যাণ হস্তের সৌন্দর্য্য-ভরা

—আর তোমার কতদিন অসুখ করেছে—ও মায়ের মত সেবা করছে—

স্বামী যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোর হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, সত্যই সে স্ত্রীকে এতদিন বোঝে নাই, সে পরিহাস করিয়াছে, অবহেলা করিয়াছে, সে তাহার কল্যাণী লক্ষ্মী, তাহার সেবিকা মাতা! প্রেম ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বামী স্ত্রীর দিকে চাহিল। স্ত্রীর কিন্তু সহ্য হইল না। সে রত্ন! সে লক্ষ্মী! সে মা! এই অতিথিটি পরিহাস করিতেছে—না, সত্য ভাবিয়া বলিতেছে। সে ক্ষুব্ধ ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—আপনি কিছু জানেন না, আমি ভণ্ড, আমি সৌখীন, আমি ভালবাসি না। তাহার দুই চোখে জল টলটল করিতে লাগিল।

রহস্যময় মধুর হাসিয়া অতিথি দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল—তুমি ভালবাস না? তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইতেই কোণের গোল টেবিলের উপর একখানা এলবাম চোখে পড়িল। এলবামটি লইয়া খুলিয়া বলিল—এখান আমিই বিয়ের সময় দিয়েছিলুম দেখছি—এই দেখ তোমাদের দু'জনের বিয়ের সময়ের ফটো—দেখ ওই নববধূর মুখ আর তোমার মুখখানা, এখন আয়নায় দেখ—ভালবাস—তুমি জান না তুমি তোমার স্বামীকে কত ভালবাস—

স্ত্রী দেখিল, সত্যই কোন মায়ামন্ত্রে তাহার মুখ বদলাইয়া গেছে; স্বামীর প্রতি গুপ্ত ব্যঙ্গ ঘৃণায় ভরা, সংসারের প্রতি পরিহাসে ভরা মুখখানি তরুণীর প্রেমাগ্নিতে রঙীণ, বেদনায় করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

এলবামখানি অতিথির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ব্যথিতা স্ত্রী সেই বরবেশী স্বামীর ফটোর উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

তাহার চিররুগ্ন স্বামীকে মৃত্যুর পথ হইতে সে যে সর্ব্বদা আগলাইয়া আছে সেকি কেবল—? বসন্ত শেষে জীর্ণ পাতার মত হঠাৎ তাহার স্বামী

ঝরিয়া যাইবে, যৌবনের মত খসিয়া পড়িবে, তারপর তাহার চিরগ্রীষ্মের জ্বালা, চিরবর্ষার অশ্রুজল—এই জন্য কি? না, না, সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে।

স্বামী প্রেমকরুণ নয়নে স্ত্রীর দিকে চাহিল- সত্যই সে তাহার রত্ন।

সন্ধ্যাবেলায় ছাদে জ্যোৎস্নালোকে অতিথিটি তাহার বেহালা লইয়া বাজাইতে বসিতেই কর্ত্তার ছোট ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—এখন বেহালা বাজিও না, বাবা ওই ঘরে, বাবা নীচে গেলে—

বাড়ীর মধ্যে একমাত্র এই ছেলেটিই সরল স্বাধীন প্রাণে ভরপূর, কিন্তু তাহার প্রাণের লীলার উচ্ছ্বাস বাড়ীর বাহিরে, স্কুলে, খেলার মাঠে, পাড়ার ছেলেদের আড্ডায় প্রকাশিত হয়, বাড়ীতে সে চুপচাপ।

অতিথি হাসিয়া বলিল—বাজিয়েই দেখা যাক না কি হয়। ছেলেটি মুখ গম্ভীর করিয়া বসিল। বেহালা শুনিতে তাহার খুব ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু একটু পরে আরম্ভ করিলে অনেকক্ষণ শোনা যাইত। ছেলেটির কথা ফলিল। কর্ত্তা সম্মুখের ঘরে একতাড়া দলিল ও একগাদা আইনের পুস্তক ঘাঁটিতেছিলেন, বেহালার ঝঙ্কার কানে যাইতেই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া ছাদে আসিলেন। অতিথিটি কিন্তু মসগুল হইয়া একটি উর্দ্দু গান বাজাইয়া যাইতে লাগিল। কর্ত্তা আসিয়া একটু মুগ্ধ হইয়া বেহালা বাজান শুনিতে লাগিলেন—এই চাঁদের আলো, বেহালার মধুর ঝঙ্কার, পুরানো পরিচিত গানের সুরের স্মৃতি—সব যেন মায়াজাল রচনা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। গানটি বাজান শেষ করিয়া অতিথি মৃদু হাসিয়া বলিল—বস, দাদা। দাদা মাদুরে বসিয়া বলিলেন—বেশ বাজাচ্ছিস ত—আচ্ছা সেই—সেই গানটা মনে আছে—

—তুমি এসব ভুলে গেছ দাদা? একটু বাজাবে? আচ্ছা আগ্রায়

সেই বেহালা বাজান মনে পড়ে—তুমি তখন নতুন শিখেছ, কি সখ—বল্লে, পূর্ণিমার রাতে তাজমহলের পাশে বসে বেহালা বাজাতে হবে—, বেহালা সারিয়ে ঠিক করা হল, গানের সুর ঠিক করা হল,—আর সন্ধ্যেয় খেয়ে উঠতেই বিষ্টি নামল—তুমি মনের দুঃখে একটা কবিতাই লিখে ফেল্লে—আমার মনে আছে।

যৌবনের সেই স্বপ্নভরা আনন্দভরা দিনগুলি! আজ তাহার রুক্ষ রহস্যহীন মুখ দেখিলে কেহ কি বলিবে এই লোক একদিন বেহালা বাজাইয়াছে, কবিতা লিখিয়াছে, তাহার কোন মক্কেল এ কথা বিশ্বাস করিবে কি! চাঁদের আলো দাদার চোখে বড় করুণ বোধ হইল। যৌবনের রূপ রস গন্ধ আনন্দ লইয়া মূর্ত্তিমান বসন্তের মত এই যে যুবক তাহার পাশে বসিয়া—তাহার দিকে তিনি ক্ষুব্ধ ব্যথিত নয়নে চাহিলেন। জীবনতরী কখন বছরের পর বছর স্বপ্নময় যৌবনের সৌন্দর্য্যপুষ্পময় প্রেমসঙ্গীতমুখর ঘাটগুলি পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। বিগত যৌবনের স্মৃতি এ জ্যোৎস্না রাতে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন—আরও বাজাও ভাই, বেশ হাত তোমার, সেই—সেই সুরটা মনে আছে—আমি প্রায়ই বাজাতুম—

বাবা সত্যই বেহালা শুনিতে বসিলেন দেখিয়া ছোট ছেলে অবাক হইল। বাবা যখন বেহালার সঙ্গে গুন গুন স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, তখন সে মন খুলিয়া হাসিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল। সে রাতে বাবার আর আইন পড়া হইল না, মুদির দোকানের মাসিক হিসাব দেখার কথা ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, তিন নম্বরের সবাই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্য রাতে মাঝে মাঝে ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া জানায় রাত্রেও

তিন নম্বর নীরব থাকে না। আজ কিন্তু সেও নীরব। অতিথিটি বেহালা বাজান বন্ধ করিয়া ছাদের কোণে এক ইজিচেয়ারে দশমীর চাঁদের আলোয় বসিয়াছিল, সম্মুখে পথের কদম গাছে জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটি রঙীণ স্বপ্নের মত দাঁড়াইয়া। তাহার চিরশান্ত স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এখন কোন অজানা বেদনায় একটু করুণ, একটু তৃষিত উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শুভ্রস্বপ্নের মত কে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সুন্দরী জ্যোৎস্না যেন মর্ত্ত্যভূমে মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার ব্যথিত মুখখানি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে সে তাহাকে চিনিতে পারিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুবক অতিথিটি বলিল,—তুমি! তুমি এখানে?

তরুণী লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—হাঁ, আমি এখানেই ত আছি।

—আমার সারাদিন মনে হয়েছে, তুমি যেন এ বাড়ীতে আছ, সারাদিন মনটা খুঁজেছে, বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলুম।

—আমার কথা!

—হাঁ, কেমন আছ?

—ভালই আছি।

যুবকটি করুণ চোখে তরুণী বিধবার ব্যাকুল মুখখানি দেখিল, তাহার হৃদয়ে এ মুখের যে ছবি আঁকা আছে সেটি ত এমন কর্ম্মক্লান্ত শীর্ণ দুঃখভারনত নির্ব্বাক বহ্নিময় নহে। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—না, তুমি ত ভাল নেই আমি দেখতে পাচ্ছি, এ বাড়ীর মধ্যে সবাই ভাল আছে কিন্তু তুমি নও।

মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তির অবগুণ্ঠন টানিয়া তরুণী বলিল—ভাল নেই? —বেশ আছি।

যুবক ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—না, তুমি ভাল নেই, তুমি স্বাভাবিক নেই,

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে, লোহার ছোট খাঁচায় পোরা বনের পাখীর মত সে ছট্‌ফট্‌ করছে, কাঁদছে—আপন ব্যথায় গুমরে মরে আপনার পাখা দু'টা ছিঁড়ে খসিয়ে ফেলছে লোহার খাঁচার শিকের ওপর আছাড় খেয়ে খেয়ে—শেকলে আঘাত করে তার পা'কে পঙ্গু করছে—আমি দেখতে পাচ্ছি—তোমার দেহের রং দেখেই বুঝছি—আপনার মধ্যে তুমি আপনাকে দগ্ধ করছ—

তরুণীর চোখ জলে ভরিয়া টল টল করিতে লাগিল, তাহার মূক বেদনা অস্ফুট আর্ত্তনাদে একটু প্রকাশ পাইল।

যুবকটি ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—না, বাঁচবে না তুমি এম্নি করে, বাঁচবে না! হায়, পদ্ম, এমন বসন্ত জ্যোৎস্নায় তোমার বুকে কালো পাথরের বিজন অন্ধকার কে চাপাল! বেরিয়ে এস তুমি—চলে এস—যাবে আমার সঙ্গে?

ঝলমল মুখে তরুণী যুবকটির চোখে চাহিল। যুবকটি বলিল,—দেখ প্রথম যৌবনে তোমাকে আমি খুঁজেছিলুম, আজও আবার তোমায় চাইছি—আসবে আমার সঙ্গে—তুমি না হ'লে আমার ঘর আর কেউ বাঁধতে পারবে না—বল—বল—

তরুণীর সমস্ত দেহ সেতারের তারের মত কাঁপিয়া উঠিল, সে যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে, স্বপ্নের ঘোরে সে যেন বলিল—তুমি! যাব? কোথায় যাব!

তারাভরা আকাশের তলে মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় সেই তরুণী ও যুবকের মনে হইল, ওই দুটি তারার মত পাশাপাশি তাহারা যদি নিঃশব্দে সহজ আনন্দে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া চলিয়া যাইতে পারিত! তাহারা যদি চিরদিন এই জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশের মত সংসারের সমস্ত আচার-বিচার তর্কহীন কোন সৌন্দর্য্যপথ দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া ওই দুইটি শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডের মত সুন্দর মধুরভাবে ভাসিয়া যাইতে পারিত!

সহসা ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিল, একটা নিশাচর পাখী ডাকিয়া উড়িয়া গেল, রাস্তা দিয়া একটা মোটর চলিয়া গেল, তাহদের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জলভরা চোখে যুবকের দিকে চাহিয়া তরুণী চলিয়া গেল।

ছাদ পার হইয়া একবার সে ভাইবির ঘরের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর হাতে মাথা রাখিয়া স্ত্রী সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আনন্দে ঘুমাইতেছে। একবার গিন্নির ঘরের দরজার কাছে একটু থামিল, মা তাঁর খুকীকে স্নেহবক্ষে জড়াইয়া আদর করিতেছেন। জেঠাইমার ঘরে উঁকি মারিল, প্রৌঢ়া বিধবা তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থ ও হরিনামের মালার পাশে অঘোরে ঘুমাইতেছেন। সে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল না—বারান্দার এক কোণে শুইয়া পড়িল।

একদিন এ যুবকটি তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, সেও ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের বিবাহের কথাও হইয়াছিল, তারপর যুবকটির ভয়ঙ্কর অসুখ করিল—অন্য জায়গায় তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সে প্রেমিক যুবক বাঁচিয়া আছে, সে যৌবন-বসন্তের মত তাহার প্রাণের দ্বারে আবার অতিথি হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে প্রেমিকা কিশোরী যে কবে মরিয়া গিয়াছে! হায় সে কি করিবে? এক জ্যোৎস্না রাতে এই যুবকের কণ্ঠে সে যে গান শুনিয়াছিল তাহার উচ্ছ্বসিত সুর তাহাকে ভাসাইয়া দিল—আজি বসন্ত জাগ্রত তার দ্বারে!

ইহার পর সাত দিন কাটিয়া গেল। এই সাতদিনে তিন নম্বরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া পাড়ার লোকেরা অবাক্ হইল। তিন নম্বর ত চিরদিন এই রকম ছিল না। এই অতিথিটির কিশোর বয়সে এই তিন নম্বরে বেহালা বাজিত, গান উঠিত, হাসি উঠিত, তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা হইত, সেই জীবনআনন্দকল্লোলময় তিন নম্বরের বিগত দিনগুলির স্বপ্নে

আবার তিন নম্বর উতলা হইয়া উঠিল; এ অতিথি তাহার সুখস্মৃতি বহন করিয়া লইয়া আসিল। অতিথিটির প্রথম যৌবনের রঙীণ চিত্তপটে' দাদা, বৌদি, জেঠাইমা সবাইয়ের যে ছবিগুলি আঁকা আছে, তাহা হইতে আজিকার তিন নম্বরের লোকগুলি অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু উল্লসিত যৌবনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে এ অতিথি তাহা স্বীকার করিল না। সংসারের এ পরিবর্ত্তন সে মানিল না। সে বলিল, তোমাদের সেই যৌবনের সৌন্দর্য্য আনন্দ উচ্ছ্বাস শুধু আমার স্মৃতিতে নয়, তোমাদের বর্ত্তমান জীবনেই লুকান রহিয়াছে, আমি দেখিতে পাইতেছি। তিন নম্বরের লোকেরা অতিথির এ স্বপ্ন মানিয়া লইল। একটা লোক যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া বলে, তুমি সৎ, তুমি সুন্দর, তাহার সম্মুখে কেহ সহজে হীন মন্দ কাজ করিতে পারে না। লোকনিন্দার ভয়ে পরিচিত জনের বেদনার লজ্জায় সমাজের বেশীর ভাগ লোক সৎপথে থাকে। এই অতিথিটির মন খুসি রাখিবার জন্য তিন নম্বরের লোকেরা বদলাইয়া গেল। জেঠাইমার আর ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ হইত, একদিন শুক্‌নো কাপড় তুলিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার কাপড় ছেঁড়া, একটু রাগিয়া বলিলেন, কাপড় ছিঁড়লে কে? কে একজন উত্তর দিল—বেড়ালে।

বেড়ালে! অন্য সময় হইলে এই লইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিত। আজ তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

গিন্নি হয়ত ঝিকে আর একটু খাটাইবার জন্য বলিতে যাইবেন, দেখ, ওই কড়ার তলায় কালো দাগ ওঠে নি, আবার মাজ,—সহসা অতিথিকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিলেন, বলিলেন—বেশ মাজা হয়েছে। ভাইঝি-জামাই কর্ত্তাকে গিয়া জানাইল, সে ভাল কাজ পাইলে করিতে রাজী আছে। সে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে।

অশান্ত মনগুলি শান্ত হইল, কলহমুখর মুখগুলিতে আনন্দের হাসি

ফিরিয়া আসিল, কিন্তু যে তরুণী বিধবা নিঃশব্দে শান্তিতে এ সংসারে কাজ করিয়া যাইতেছিল সে যে বেদনায় দিশাহারা হইয়া গেল। হায়, তুমি কেন এলে? কেন তোমার চোখের চাহনায় মূক বেদনা মথিত করিয়া তুলিলে, কেন এ অন্ধকারে বন্দিনীর দ্বারে রঙীণ পথের বাঁশি বাজাও? যৌবন পথিক, তুমি কেন এলে?

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশে মেঘ ও জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলা, মৃদু বাতাসে কদম গাছটি প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার বুকের মত কাঁপিতেছে। বাড়ীখানি নিঝুম, সুপ্ত।

তরুণীটি উঠানের সামনে রকের কোণে বুকে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার কালো চুলের ভার কালো যবনিকার মত মুখের সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়া চাঁদের আলো হইতে ব্যথায় রাঙা মুখখানি ঢাকিয়াছে। সে ভাবিয়া ভাবিয়া দিশাহারা হইয়াছে, পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সহসা এক মৃদু পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিল। চুলগুলি সরাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল না, বুঝিতে পারিল কে আসিয়াছে।

অতিথি বলিল—শোন, চাও!

আপনাকে আর সে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না, চুল দোলাইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল, যুবকের চোখের দিকে বিমুগ্ধ হইয়া তাকাইল, চাঁদের আলোয় চোখ দুটি হীরার মত ঝকমক করিতেছে, সাদা আলখাল্লা ঝলমল করিতেছে—নিবিড় অন্ধকারময় বিজন গিরিপ্রান্তরের মধ্যে পথহারা পথিক সহসা দূরে একটি আলোক শিখা দেখিলে যেমন জয়ধ্বনি করিয়া ওঠে তেমি তাহার তরুণ অন্তর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু নিমেষের জন্য—আবার সে কালো চুলে মুখ চাপিয়া বুকে মাথা গুঁজিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—কেন তুমি এলে? যাও, তুমি যাও!

বসন্তের শেষরাত্রির দক্ষিণ হাওয়া ফুলেদের কাণে কাণে যেমন চুপে প বলে তেম্নি ধীরে অতিথি বলিল—আমি চলে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

আর একবার চোখের সম্মুখ হইতে চুলের বোঝা সরাইয়া তরুণী তৃষিত সজল নয়নে পথিকের বিদায়করুণ মুখখানি দেখিল, তারপর চোখ বুজিয়া মাথা নত করিল।

অতিথি যখন ধীরে দরজা খুলিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মায়াপথ দিয়া দক্ষিণ বাতাসে সুদূরে কোথায় চলিয়া গেল, তরুণী শিহরিয়া উঠিল, চঞ্চল পদে দরজার কাছে গেল, আলোছায়াময় আঁকা বাঁকা গলিটি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ওইত যৌবন-পথিক চলিয়াছে, কত সৌন্দর্য্যের দেশে, কত ফুলের গানের দেশে যাইবে।

তরুণী দরজা পার হইল না, দরজা বন্ধও করিল না, চৌকাঠের ওপর মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল।

চাঁদ মেঘে ডুবিয়া গেল, জমাট অশ্রুর মত সাদা কাপড়ের ওপর এলানো কালো চুলগুলি রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল।

খেয়াঘাটে

খেয়াঘাটে

—•—

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত। খোলা জানালা দিয়ে প্রভাতের মূর্চ্ছাহত আলোময় গলিটার দিকে চেয়ে আছি। গলিটা যেন পথ খুঁজে খুঁজে পাচ্ছে না, ঘুরে ঘুরে মরছে, সে ত সোজাই চল্‌তে চায়, কিন্তু এদিকে ফির্‌লে বড় লাল বাড়ীটা তাকে ধাক্কা দিয়ে একেবারে বাঁয়ে ঠেলে দিলো, সেদিক থেকে হল্‌দে বাড়ীটার ধাক্কা খেয়ে সাদা বাড়ীটার পায়ের তলায় গিয়ে পড়্‌লো। এঁকেবেঁকে কোনমতে সে চলেছে, তার এদিকে আঁস্তাকুড়, ওদিকে ড্রেন, মাঝে কোথাও গর্ত্তে জল জমেছে, কাদায় ভরেছে, কোথাও খোওয়া সব কঙ্কালের মত বেড়িয়ে পড়েছে। স্তম্ভিত কালো আকাশের ছায়ায় জলসিক্ত স্তব্ধ বাতাসে এই আঁকাবাঁকা গলি নগরলক্ষ্মীর কোন শীর্ণ মলিনকন্থা রিক্তভূষণ ভিখারী সন্তানের মত চুপ করে পড়েছিলো, সহসা সানাইয়ের মঙ্গলরাগিণীতে আকুল হয়ে উঠেছে; কিন্তু এ শ্রাবণপ্রভাতে বিবাহোৎসবের সাহানার সুর এ কালো গলিতে বড় করুণ বাজ্‌ছে, মনে হচ্ছে, সারারাত ঝড়ে জলে যে কান্না গলিতে বদ্ধ হয়ে আছাড়ি পিছাড়ি ক্ষুব্ধ মত্ত হয়ে ঘুরেছে, প্রভাতে তা শান্ত হয়ে সানাইয়ের সুরে ঝরে ঝরে পড়্‌ছে।

দিনরাত চুপ করে শুয়ে একা দেখে দেখে, কি জানি, গলিটা আমার কাছে কেমন জীবন্ত হয়ে গেছে, এ কালোপাথরভরা যাতায়াতের নির্জ্জীব পথ নয়, এরও একটা বিশেষ রূপ আছে, প্রাণ আছে, হয় ত এ অহল্যার মত পাষাণ হয়ে গেছে। কখনো গভীর রাতে চাঁদের আলো যদি এর

কালো পাথরে ঝিকিমিকি করে, দক্ষিণ হাওয়া হঠাৎ যদি ভুলে এই পথে চলে আসে, বড়রাস্তার কৃষ্ণচূড়া বা কদমগাছ হতে ঝরা ফুল পাতা যদি উড়ে এসে এর বুকে পড়ে, আমি দেখি, ও আনন্দে শিউরে উঠে। তাই মাঝরাতে বার বার মনে হচ্ছিলো, যখন আকাশ ভেঙে জল ঝর্‌ছিলো আর নৃত্যময়ী রঙ্গিণীদের মত জলের ধারা কলগানে চলেছিলো, এ গলি যেন দুধারের বাড়ীর সারির বাঁধনে আপনাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ছিলো না, সব ভেঙ্গে চূরে ভাসিয়ে নেচে ছুটে যেতে চায়—মাঝে মাঝে হেসে উঠ্‌ছিলো, তারপর কান্না আর কান্না। সে কান্না এখন রসুনচৌকির সুরে তার বুক ভরে বাজ্‌ছে।

তুলি নিয়ে গলিটার একটা ছবি আঁকৃতে বস্‌লুম—দুধারে ভূতের ছায়ার মত বাড়ীর সারি, মাঝখানে কালো গলি হতশ্রী, বন্দী, একা পড়ে রয়েছে। হঠাৎ মনে হলো, ও কান্নাটা যে আমার বুকের। তুলি আর চল্‌লো না।

মালতীকে ডেকে বল্লুম, হ্যাঁরে, আজ বুঝি ওদের বাড়ী বিয়ে।

ম্লান হেসে সে বল্লে, না দাদা, আজ গায়ে-হলুদ, পরশু বে।

সাম্‌নের চারতোলা লালবাড়ীর ছাদের হোগ্‌লাগুলোর দিকে চেয়ে বল্লুম—ও।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে চলে যাচ্ছিল, আবার ডেকে বল্লুম—তোকে নেমন্তন্ন করে নি রে?

—হাঁ, সুধার দিদি এসেছিলেন, তুমি কেমন আছো জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

—কি গায়ে-হলুদ পাঠাবি?

—তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বো ভাব্‌ছিলুম।

—দেখ্, আমার একখানা ছবি পাঠিয়ে দে, নিয়ে আয়ত ছবিগুলো আমি বেছে দিচ্ছি।

ভীতনয়নে সে আমার মুখের দিকে তাকালো, ভাব্‌লে বুঝি একবারে মাথা খারাপ হয়েছে। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত বল্লে, আচ্ছা দেখ্‌ছি। কিন্তু করুণনয়নে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হেসে বল্লুম, না রে, আমার মাথা খারাপ হয় নি— আমি সত্যি বল্‌ছি, একটা ভালো ছবি পাঠিয়ে দে, কি সবগুলো, কি আর হবে ওগুলো রেখে—আর শাড়ী সন্দেশ কেন্‌বার টাকা কোথায় পাবি বল্‌—

সে এবার বাস্তবিক ভয় পেলে। তা হয়ত আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে, ভুগ্‌ছি ত বড় কম দিন নয়, তিনমাস হলো। বল্লুম, যা ভালো হয় কর্‌গে যা।

স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। মেজাজটা কেমন খারাপ হয়ে গেলো, ক্রুদ্ধ রুক্ষ স্বরে বল্লুম, যা দিগে যা মায়ের বিয়ের শাড়ীখানা আছে—

—না, কিছু দিতে হবে না, ওদের বাড়ী বিয়ে তা আমার কি বল্‌—তুই যাস্‌নে ওদের বাড়ী—বড়লোক আছো থাকো, গরীবদের এমন অপমান করার দর্‌কার কি নেমন্তন্ন করে—

চোখের জল চেপে মাথার কাছে বসে মালতী হাওয়া কর্‌তে লাগ্‌লো; কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। সাম্‌নের ঘড়িতে টং টং করে আটটা বাজলো। ঝাঁঝালো সুরে বল্লুম, হ্যাঁরে, এখনো ওষুধ দিলি নি, দুধ খাবার কিছু হয়েছে, না আজ রসুনচৌকির বাজনা শুনে পেট ভরে যাবে।

এবার মালতী ঘর ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। আমার সাম্‌নে সে কাঁদতে চায় না, পারে না। কোন্‌ দুঃখের অগ্নিতে যে চোখে রসব অশ্রু শুকিয়ে তপ্তবাষ্প হয়ে গেছে তা সে বেশ জানে। তবু চোখের পাতাগুলো ভিজে এলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাক্‌লুম—মালতী।

হাসিমুখে সে ছুটে এলো, যেন কিছুই ঘটেনি। কোন বেদনার স্মৃতিকে সে আমার সাম্‌নে জাগাতে চায় না।

—কি দাদা, আর এক মিনিটে তোমার দুধটা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁরে, বিনেটা এখনও জাগে নি?

—কৈ, তোমার বন্ধু এখনও দিব্যি ঘুমোচ্ছেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত কি লেখাপড়া হয়েছে।

—তুই মাঝখান থেকে মারা গেলি মালতী, এই তোর হতভাগা দাদা আর তার পাগ্‌লা কবি বন্ধু--তা তোর দাদা তোকে বেশী দিন জ্বালাবে না।

—কি যা তা বল্‌ছো দাদা—চুপ করো--

—ওরে কালাজ্বর, বুঝ্‌লি—কালাজ্বর, ও ত মৃত্যুরই পরোয়ানা।

—কেন তোমার বন্ধুটি ত বল্‌ছিলেন, কোন্ ডাক্তারের কাছে কি নতুন চিকিৎসার কথা শুনে এসেছেন—কত লোকের সার্‌ছে, খুব সার্‌বে দাদা, তুমি খালি ভয় করো, একটু মনে বল আন্‌বে না।

—ও, সে injection,—তার খরচ কত, এ পোড়া বাড়ী বেচ্‌লেও হবে না, আর এম্নি করে বেঁচে কি হবে বল্?

—দাদা...

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে চলে গেলো। সে কি বল্‌তে চায়? সে বল্‌তে চায়, আচ্ছা দাদা তুমি যদি মরো, আমার অবস্থা কি হবে বলো দেখি, হিন্দুসমাজে চোদ্দবচ্ছরের মাতৃ-পিতৃহীনা অনূঢ়া কন্যা—তুমি ছাড়া আর আত্মীয় বল্‌বার কেউ নেই। না, সে বল্‌তে চায়, সুধাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে না, এ দুঃখেই কি তুমি মর্‌তে চাও, আর আমায় যদি তোমার ক্ষ্যাপা কবিবন্ধুটি বিয়ে না করে তবে আমিও গলায় দড়ি দেবো বল্‌তে চাও; আমি যদি ধরো পাশের মেসের কোন ছেলেকে ভালো-

বেসে ফেলি, আর তার বিয়ে যদি পরশু ঘটে যায় তবে পরশু রাতে কি আমি গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মর্‌বো ?

ভালো লাগে না ভাব্‌তে। ভাব্‌লুম, একবার মালতীকে ডেকে বোঝাই, আমি ত বাঁচ্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ছি, যদি মরি আমার কি দোষ বল্‌। তাকে আর ডেকে কোন ব্যথা দিতে মন সর্‌লো না।

তার চেয়ে পুরানো মধুর স্মৃতিগুলো ভাবি। কীটসের মত যদি আমার রঙীন কল্পনাশক্তি থাকৃতো, বেশ থাকৃতুম। কবি কল্পনাকে প্রিয়া কর্‌তে পার্‌লে পৃথিবীর কোন দুঃখের স্পর্শ লাগে না। কেননা,

She will bring inspite of frost
Beauties that the earth has lost.

ভাব্‌ছি বর্ষা নেই, বসন্ত এসেছে, আকাশ মেঘমেদুর নয়, নীলোজ্জ্বল, মনভোলানো, বাতাসে কে মদিরা ধারা ঢেলে দিয়েছে, গলির মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটা লালে লাল। বসন্তপ্রভাতে সরু গলিটাও বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে, আমার ভাঙ্গা ছোট ঘর হাস্‌ছে, তুলির পর তুলি বুলিয়ে ছবি এঁকে চলেছি। লাল বাড়ীটার ঠিক সামনের ঘরে সুধা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো জান্‌লার পাশে একটু এসে দাঁড়াচ্ছে, কখনো নানা অকাজ সৃষ্টি করে টেবিল গুছোচ্চে, বিছানা ঝাড়্‌ছে—যেন ফুলের বনে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপমঞ্জরী প্রভাতের হাওয়ায় আনন্দে দুল্‌ছে, এখনো সে সব পাপ্‌ড়ি মেলেনি, সব সৌরভ ছড়ায়নি। আমি যে তাকে দেখ্‌ছি তা সে বেশ জানে, তবু যেন দেখ্‌ছি না, এম্নি ভাবে মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে—হঠাৎ চোখে চোখে মিলন হয়ে যায়, তার গাল লাল হয়ে ওঠে, তার সরল চোখদুটো বলে—তুমিত ভারি দুষ্টু, আমি জান্‌লা বন্ধ কর্‌তে যাই, সে পর্দা সরায়; আবার আমি পাখি

তুলি, সে পর্দা গুটোয়; অন্তরের মাধুরী দিয়ে তাকে এঁকে যাই। জান্‌লা খুলি, ধীরে সে চলি যায়, দেখি তার দেহে শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব লেগেছে, গতি মন্থর, নয়নের দৃষ্টি গভীর রহস্যাকুল, কি কর্‌তে কি করে ফেলে, কাজের মাঝে বার বার আন্‌মনা হয়—ধীরে সে চলে যায়, গোলাপী শাড়ীর ওপর কালো কেশ দুল্‌তে থাকে। তুলি পড়ে থাকে, কি নিবিড় সুখে মন ভরে আসে।

মাধবী রাত্রি, রূপালী জ্যোৎস্না গলির তলায় গিয়ে পৌঁছাতে পারেনি, আমার ঘরে একটু এসে পড়েছে। অন্তর কানায় কানায় ভরা, স্তব্ধ, এ জোৎস্না রাত্রির মত স্তব্ধ। শীত অন্ত, বসন্তের প্রথম বাতাস বইছে। আমার ঘরে অর্দ্ধেক জোৎস্নার আলো, তার ঘরেও অর্দ্ধেক জোৎস্নার আলো—দুজনে জোৎস্নালোকের দিকে চেয়ে এ চঞ্চল আকুল নিশীথে চুপ করে বসে আছি। সে আমাকে দেখ্‌ছে না, আমিও তাকে দেখ্‌ছি না, কিন্তু সে যে বসে আছে এ কথা দেহে মনে কেন অনুভব কর্‌ছি।

এ গতদিনের সুখস্মৃতির চেয়ে অনাগতদিনের সুখস্বপ্ন সৃষ্টি কর্‌তে আরো ভাল লাগে। ধরো, আমি যদি বন্দ্যোপাধ্যায় না হয়ে ঘোষ কি দাস কি বোস হতাম, মিত্র ছাড়া যে কোন কায়স্থ-পরিবারে জন্মাতাম, আর, হাঁ, আর আমার যদি অনেক টাকা থাক্‌তো, তা হলে সুধার বাবা ত আমাকে কোনমতেই প্রত্যাখান কর্‌তে পার্‌তেন না।

অথবা ধরো, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ বলে বিশ্রী জিনিষটা যদি না থাক্‌তো; দেখো, নগ্নবর্ব্বরতার যুগে অসভ্য মানুষদের ব্যবস্থা ছিলো যার গায়ে জোর বেশী নারী তার, যে তাকে বাহুবলে জয় করে নিতে পার্‌বে তারি সে উপভোগ্যা। আর এ সভ্যবর্ব্বরতার যুগে মানুষের ব্যবস্থা দেখ্‌ছি, যার সিন্দুকে টাকা বেশী নারী তার, যে তাকে সোনা দিয়ে কিনে নিতে পার্‌বে। তা হলে প্রেম জিনিষটা কি নেহাৎই ফাঁকি? ধরো,

এমন যদি সমাজ ব্যবস্থা থাক্‌তো, যে যাকে ভালবাস্‌বে সে তাকে বিয়ে করবে, ভালো না বাস্‌লে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না, তা হ'লে—

সে তাহ'লের কথা ভাব্‌তে চোখে জল আসে কেন? আমি একেবারে ক্ষেপে গেছি দেখ্‌ছি। বিকল হয়ে গেছে মাথাটা।

মালতী দুধসাবু নিয়ে মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধস্বরে ডাক্‌লে—দাদা। তার কাতর চাউনিতে বুঝ্‌লুম সে বল্‌ছে, দাদা, ভেব না, লক্ষ্মীভাইটি অত ভাব্‌লে তুমি কেমন করে সার্‌বে?

বল্লুম, হ্যাঁরে, মালতী, তোর ভারি কষ্ট হচ্ছে, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সহজ রে—আর মিছামিছি লড়্‌ছিস্।

রাগে মুখ গম্ভীর করে বল্লে, নাও, দুধটা খেয়ে নাও দেখি, আবার খানিক পরে ওযুধ দিতে হবে।

তাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি, আর কষ্ট বারাতে চাইলুম না, শান্ত হয়ে দুধটা খেয়ে নিলুম। বাটি নিয়ে আবার সে চায়ের জল চড়াতে গেল।

এম্নি করে রোগশয্যায় পড়ে থাকা, এ যেন একটা ভোগের জীবন। অবশ্য মাঝে মাঝে জ্বরের প্রকোপটা যখন বেশী হয় তখন একটু যন্ত্রণা হয়—তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকা, ছবি আঁকা, সে সত্যি তুলি দিয়েই হোক আর রঙীন কল্পনা দিয়েই হোক। মালতী আর বিনয় মিলে আমায় খাওয়াচ্ছে, সেবা কর্‌ছে, আনন্দ দিচ্ছে। কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে নবেল পড়ো, স্বপ্ন দেখো, নিজের মন নিয়ে যা খুসি খেলা করো। না, কাজ কর্‌তে চাই, এম্নি চুপচাপ শুয়ে শ্রান্তি আসে, জীবনের উপর বিরাগ, বিদ্বেষ আসে—শক্তি যদি না থাকে তবে ভেঙ্গে যাক এ জীবনের জীর্ণপাত্র, আবার নতুন পাত্র ভরে নবজীবনের মদ ফেনিল হয়ে উঠুক।

মালতী, এ আমার সেবায় মা, স্নেহে বোন, পরামর্শে বন্ধু, গৃহকাজে

দাসী, আদরে আব্দারো ছোট খুকী—ওর মুখে চাইলে মর্তে ইচ্ছে করে না, ভাব্তে বড় কষ্ট হয়,—আমি চলে গেলে আমর বন্ধু কি ওকে ঠিক রাখ্তে পার্বে ভাব্ছি।

সহসা এক খুন্তি হাতে করে মালতী চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুক্লো।

—দেখোনা দাদা, তোমার বন্ধু কি কর্ছে।

তার পেছন পেছন বিনয় এক আর্সোলা হাতে ঝুলিয়ে এলো।

—কেন আমায় ছেঁকা দিতে গেছ্লে?

—বা, তুমি যদি দশটা পর্য্যন্ত ঘুমোও জাগাতে হবে না?

—জাগালেই আমি স্থির থাকৃতে পারি না জানো, আমার নাম কে ভুলে বিনয় রেখেছিলো, আমি হচ্ছি চঞ্চলকুমার।

মালতীর দিকে সে অগ্রসর হলো, আর মালতী এমন ভাবে ঘরের চারিদিকে দৌড়ে ঘুর্তে লাগ্লো যেন তার প্রাণসংশয়।

আমি হেসে বল্লুম—বিনি থাম্।

—না, তুমি জানালা দিয়ে ফেলে দাও,—বলে মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালো।

বিনয় আর্সোলাটা গলিতে ফেলে দিয়ে আমার পাশে বসে আমার শীর্ণ হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলে। তাদের এই কৌতুক-অভিনয় আমাকে অনেকটা আনন্দ দেবার জন্য; আমার সহাস্য মুখ দেখে তারা থাম্লো।

—বন্ধু, কেমন, রাতে ঘুম হয়েছিলো?

—কেমন আর কি, দেখ্ছোনা মরণের রসুনচৌকি বাজ্ছে।

মনে ঘা খেলেও মুখে হেসে বিনয় বল্লে, আমি ত শুন্তে পাচ্ছি না।

তার মনটা হাল্কা কর্বার জন্য বল্লুম, কাল রাত জেগে কি সব কবিতা লেখা হয়েছে।

—সে দুপুরে শুনবে—দেখি চাটা কতদূর হলো,—বলে সে চলে গেলো।

মালতী একা যে বাসন মাজ্‌বে, ঘর ধোবে, আগুণ ধরাবে, রাঁধ্‌বে তা সে সইতে পারে না ; জল তুলে, কয়লা ভেঙ্গে, কুটনো কুটে সে তাকে কিছু সাহায্য কর্‌তে গেলো।

বেশ আছি আমরা। এক কপর্দ্দকহীন কালাজ্বর রোগী—তার ওপর সে ব্যর্থপ্রেমিক ও ছবি আঁকে ; এক গৃহপরিবারহীন ভবঘুরে কবি ; আর এক মাতৃপিতৃহীনা অবিবাহিতা কিশোরী। আমাদের সংসার যে কেমন করে চল্‌ছে তা আমার কাছে বড় রহস্য মনে হয়। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বিনয় বলে, চলে ত যাচ্ছে, বাপু,—দেখ্‌ছো, আমরা কারো চুরিও কর্‌ছি না আর ধারও ধার্‌ছি না। তোমার সব খোঁজে দর্‌কার কি, অসুখ করেছে, এখন তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে সেরে ওঠা, তোমার কাজ তুমি করে যাও।

রসুনচৌকিটা থেমেছে, ঘন ঘন শাঁক বাজ্‌ছে। লাল রংএ ছোপানো কাপড় পরে হল্‌দে চাদর গায়ে জড়িয়ে ঝি চাকরের দল এবার গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে আস্‌ছে—এক, দুই, তিন,—পনেরো ষোল,—আটাশ—ছত্রিশ একচল্লিশ—না, আর গুন্‌তে পারি না—কত রকমের খাবার, সন্দেশ,—কি সুন্দর এই পেঁয়াজীরংএর বারাণসীটা—ও রূপার গেলাস-বাটিগুলো ঝক্‌মক্‌ কর্‌ছে—ও লোলচর্ম্মা বুড়ি ঝিটা আর বইতে পার্‌ছে না—তার হাতে এসেন্স-সাবানের ট্রে যেন একটা বিদ্রূপের মত। কালো পটের ওপর দিয়ে কতগুলি রঙীন ছায়ামূর্ত্তি চলে গেলো—গলিটা স্তব্ধ কালো জলের মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়্‌ছে।

দিনের পর দিন চুপচাপ শুয়ে ঘরের প্রতি জিনিষের দিকে একা চেয়ে চেয়ে তাদের সঙ্গে আমার যেন অতি নিবিড় আত্মীয়তা হয়ে গেছে—ওই

ভাঙ্গা চেয়ারটা, ওই আল্‌না, ওই Calendarএ মেমের ছবিটা, ওই শিক-ভাঙা ছাতা, ওই কতদিনের না-পরা জুতো, ওই বাঁশের ছড়ি—সবাই যেন কতকালের বন্ধু। প্রতি প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে চাইলেই, এরা যেন হেসে বলে—জেগেছো? রাতে বিছানায় অনিদ্রায় ছটফট কর্‌লে, এরা যেন ব্যথিত হয়ে বলে,—ঘুমোও, শান্ত হয়ে ঘুমোও। ওই কোণের পা-ভাঙা ডেস্কটা, ও যেন এতদিন ধরে কি বল্‌বে বল্‌বে করে বলে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে, আমি তার দিকে চাইলেই তার যেন সব গুলিয়ে যায়। ওর মধ্যে আমার সব ছবি আর বিনয়ের কবিতার খাতা পোরা আছে। এদের মুখ না থাকৃতে পারে কিন্তু দুটো চোখ যেন কোথায় লুকানো আছে—কোন পূর্ব্বজন্মে ওদের সঙ্গে কত গল্প করেছি, এখন সে ভাষা সবই ভুলে গেছি। আবার মাঝে মাঝে বোধ হয়, এরা নিজেদের মধ্যে আমার রোগ ব্যথা নিয়ে কত কথা কইছে। এদের সঙ্গে জানাশোনার জন্য প্রাণটা মাঝে মাঝে তৃষিত হয়ে ওঠে।

এ যা সব ভাব্‌ছি নিছক কল্পনার খেলা, দুর্ব্বল ব্যাধিক্লিষ্ট মস্তিষ্কের সৃষ্টি—জানি, তবু মনে হয় এই যে রঙের তুলিটা, এ শুধু আমার হাতের যন্ত্র নয়, আমার প্রাণের বন্ধু, আমি যা ভাবি, এও তাই ভাবে, দুজনে অন্তরে মিল্‌তে পারি বলে আকৃতে পারি। ইচ্ছে কর্‌ছে ওই ডেস্কটাকে বা ও জুতোটাকে বা জামাটাকে আঁকি, কিন্তু তুলিটা ঘাড় নেড়ে বল্‌ছে, না বন্ধু, এখন একটু বিশ্রাম কর।

* * * *

রাতে কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিলো না। মালতী মাথায় বসে হাওয়া কর্‌ছিলো আর অনর্গল বকে যাচ্ছিলো—গায়ে হলুদ নিয়ে আশিজন লোক এসেছে, এরা দশহাজার টাকা দিচ্ছে, নগদ কিছুই নয়, মেয়েকে গয়নায় সাজিয়ে দেবে, বর বুঝি এম-এ পড়ে, ইত্যাদি।

কতক শুন্‌ছিলুম, কতক শুন্‌ছিলুম না। বল্লুম, সুধাকে একবার দেখাতে পারিস্‌?

মালতী স্নিগ্ধনেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইলো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, সে তার ছোট ভাইকে একবার সন্ধ্যাবেলা আমার কাছে লুকিয়ে পাঠিয়েছিলো, আমি কেন যাইনি, তোমার অসুখ বাড়্‌লো নাকি, জান্‌তে—তোমার সঙ্গে কি করে দেখা কর্‌তে বোল্‌বো বল—

—তা হলে তুই সত্যি যাস্‌নি, আমার কথায় রাগ করেছিলি?—অন্যায় হয়ে গেল।

—না, দাদা, যাবো।

—হাঁ, কাল যাস্‌—না, না, আমি কি আর তাকে সত্যি সত্যি এখানে আন্‌তে বল্‌ছি রে? তোর সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলুম, বুঝ্‌লি—ওরা বেশ একটা শাড়ী দিয়েছে—

—হাঁ, দাদা, সে শাড়ী পরে সুধাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো, আর গলার একটা চুনিপান্নাবসানো হার কি সুন্দর দিয়েছে—

—যা ঘুমোগে যা।

—না, দাদা, তোমায় ঘুম পাড়িয়ে যাবো, না হলে আর তোমার আজ রাতে ঘুম হবে না—ওই তোমার বন্ধু এলেন, গান শোনা যাচ্ছে, সুর না কত—কি করে উনি কবিতা লেখেন?

—যা তোরা খেয়ে নিগে যা।

শুধু একবার তাকে দেখ্‌তে চাই—রক্তপট্টবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কৃতা চন্দনচর্চ্চিতভালে সলজ্জা নববধূর আনন্দমূর্ত্তি।

* * * *

বিষ্টি বন্দ হয়েছে, আকাশটা বেশ শান্ত, একটু নির্ম্মল। মাছের আঁশের আর লুচিভাজার গন্ধ, হৈ চৈ চীৎকার, ঝি-বামুনদের ঝগ্‌ড়ার শব্দ

আস্‌ছিলো বলে ও বাড়ীর দিকের জান্‌লাগুলো সারাদিন বন্ধ ছিলো। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ যখন বর এলো, তাকে আর দেখ্‌তে পেলুম না, শুধু দেখ্‌লুম ফুলের সাজপরা আলোময় মোটরটা অনেকক্ষণ ঝক্‌ঝক্‌ আর্ত্তনাদ করে অনেক কষ্টে গলি থেকে বেরোলো।

ঘরের আলো বের করে, সব জান্‌লাগুলো খুলে, বালিসে হেলান দিয়ে জান্‌লার মুখে এসে বস্‌লুম। লাল নীল কত রংএর ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় সাজানো বিয়েবাড়ী বরযাত্রী কন্যাযাত্রী আহূত রবাহূতের গোলমালে ভরা।

আমার সাম্‌নের ঘরেই কনেকে সাজানো হচ্ছে, তার চারদিকে মেয়ের দল ঘিরে রয়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু কত নবীনা প্রবীণার কত কথা কানে আস্‌ছে।

—কনেচন্দন কৈ?—হারটা একটু ওদিক করে দাও না—আংটি কোথা গেল, আংটি?—কি সুন্দর তোমার মেয়েকে দেখাচ্ছে ভাই, যেন অপ্সরী—ডানাকাটা পরী—ওগো, চেলির ওদিকটা তুলে দাও, মেজেয় লুটোচ্ছে যে—পিঁড়ে কৈ? কি আল্‌পনা কাটার ছিরি?—ডাকোনা গো সব ভগ্নীপতিদের, কনে তুলে নিয়ে যাক—সরে দাঁড়াও না সব বাপু, মেয়ের গরম হচ্ছে দেখ্‌ছো না—মেজবৌ পাখা,—পাখা—আমার মাথা, কি আদিখ্যেতার কথাই বল্‌লেন—ওগো বউরা সব, জান্‌লাটা একটু ছেড়ে দাঁড়াও না, কনে একটু ঠাণ্ডা হোক।

কনে সাজানো শেষ হলো। সুধা দাঁড়িয়ে ভিড় সরিয়ে জান্‌লার দিকে আস্‌ছে, লাল চেলির ওপর ওই সোনার হারের চিকিমিকি, ওই হাতের চুড়ি, আংটি—ওই তার মুক্তার হার জড়ানো সুন্দর গলা—ওই মুখ দেখা যাচ্ছে—

ওঃ, ঠিক সেই সময়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর তার পুড়ে সব আলো নিবে

গেলো। আলো—আলো!—আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, ওগো, একটা আলো জ্বালো।

অন্ধকার বাড়ীটা আমার দিকে চেয়ে অট্টহাস্যে বল্লে, আলো—আলো। বর্ষা হলেও ত শুক্লপক্ষ, কি তিথি জানি না, কিন্তু চাঁদ কি সব আলো নিঃশেষ করে দেউলে হয়েছিলো, এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু জ্যোৎস্না পাঠাতে পার্‌তো না?

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলুম—সুধা—আলো—অন্ধকারে তোমার মুখ কেমন করে দেখ্‌বো!

আমার আর্ত্তনাদ বিয়েবাড়ীর লোকজনের চীৎকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু সাম্‌নের ঘরে যখন আলো এলো, সে নববধূ আর দাঁড়িয়ে নেই, সে মেজেতে লুটিয়ে পড়েছে।

মেয়েদের আর্ত্তনাদ কানে এলো—ওগো কনের একি হলো—জল আনো মেজ বৌ—পাখা—ওরে মোক্ষদা, একটা পাখা শীগ্‌গির—আহা সারাদিন খায়নি—কচি মেয়ে কি করে থাক্‌বে—যাও না বাপু সব ঘর ছেড়ে—এ ঘরে এত ভিড় কেন—কনের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে দেখ্‌ছো না—জল—পাখা—ওই যে—ওঠ্‌ ত মা আস্তে আস্তে—

বিছানায় মুখ গুঁজে পড়্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে শাঁখ ও হুলুধ্বনির শব্দে যখন মুখ তুল্‌লুম দেখি সাম্‌নের ঘরটা জনহীন, অন্ধকার, ঘরের সাম্‌নে দালানে ছাদ্‌নাতলার আলোয় সবাই গিয়ে জমেছে।

কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না, অন্ধকার ঘরটার দিকে চেয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—এখন সুধা টোপর পরা বরের সাম্‌নে পিঁড়ের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আর তাদের চারিদিকে কুলবধূরা মঙ্গলঝারি হতে জল ছড়াতে ছড়াতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘুর্‌ছে, সুন্দরীদের হস্তপদ্মের আলোকশিখায় কারও নীলবাস ঝলমল কর্‌ছে, কারও গোলাপী শাড়ীতে আগুন লেগেছে,

কারও সবুজ শাড়ীতে চাঁদের আলোর বান এসেছে—সে আলোকশিখা যুবতীতনুখচিত সোনা-হীরার আভরণে, হাস্যদীপ্ত লাবণ্যময় মুখে, আনন্দদীপ্ত চোখে, রক্তিম ললাটে, তাম্বুলরঞ্জিত অধরে, অলক্তকরক্ত চরণে, জরিজড়ানো কালো কেশে অপরূপ দ্যুতি মণ্ডিত করে বিদ্যুতের মত লীলা কর্‌ছে—তাদের চরণের তালে তালে হার বালা দুল সব দুল্‌ছে, রিনিঝিনি মৃদু শব্দ হচ্ছে—ওর মুখখানি যেন শরতের শেফালী, ওর চোখ যেন প্রভাতের পদ্ম, ওর ঠোঁট যেন বসন্তের কৃষ্ণচূড়া, ওর হাত যেন ফাল্গুনের পুষ্পবল্লরী, ওর হাসি যেন সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ওর চলন যেন বেণুবনের কাঁপন। আর এদের মাঝে পাষাণপ্রতিমার মত বসে আছে মূর্চ্ছাহতা অলঙ্কার-পীড়িতা সুধা।

এবার কনের ঘোরার পালা। দুই তিন জন মিলে গুন্‌ছে, বার বার গুলিয়ে যাচ্ছে—এক—দুই—তিন—ও যেন কত ঘণ্টা লাগ্‌ছে—এই সাত হয়ে গেলো নাপিতের গালাগাল শেষ হোলো—এবার শুভদৃষ্টি—

জান্‌লাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লুম। তারপর বিয়েবাড়ীর কোন শব্দ এসে কানে পৌঁছালো না। শ্রাবণের আকাশ ভেঙ্গে ঝড় জল এসে সব আলো গান উৎসব ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিলে।

সারারাত হাওয়া যেন পাগল মাতালের মত গলিতে বন্দ হয়ে সব বাড়ীতে মাথা ঠুকে ঠুকে হা হা করে আর্ত্তনাদ করে ফিরেছে, আর আকাশে যত যুগের যত ব্যথার অশ্রু জমা ছিলো সব ওই গলিটায় ঝরে পড়্‌লো।

* * * *

কাল দুপুরে বরকনে কখন চলে গেল জানি না। তখন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ভয়ঙ্কর ছটফট কর্‌ছিলুম। মালতী একবার চেষ্টা করে জান্‌লার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি।

বিয়েবাড়ীর সবাইয়ের মুখে এক কথা—সুধা বড্ড বেশী কাঁদ্ছে, বড্ড কেঁদেছে।

ছাত থেকে চোগ্লাগুলো খুলে নিচ্ছে, গলির কোণে আঁস্তাকুড়ে কলাপাতা ভাঙা গেলাস খুরি খাবারের পাহাড়ে কাকদের ভোজন-উৎসব বসেছে।

আকাশের ছিন্ন মেঘ হতে একটু আলো ঘরে এসে পড়েছে, হাওয়ায় যেন শরৎ-ঋতুর উত্তরীর গন্ধ। একটা ছোট চড়াই পাখী জান্লায় এসে উড়ে বস্লো। বন্ধু কাল যে রজনীগন্ধাটি এনেছে তার দিকে তার যেন লোভ। এই মুমূর্ষু চোখে ওই শুভ্রনির্ম্মল ফুলের দিকে চাইতে ব্যথা বোধ হয়। প্রকৃতির শ্যামল কোলের জন্য প্রাণ তৃষিত হয়ে ওঠে—নদীজলের ধারা, প্রভাত-পাখীদলের গান, বনভূমির সৌরভ, ফুলদলের রং, খোলা আকাশের নীচে শরতের সোনার প্রভাত। না, সে মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাইতে বড় লজ্জা হবে—সেখানে প্রাণ প্রতিপ্রভাতে সঞ্জীবিত হয়ে নবরূপ ধারণ করে, কত কত লক্ষ লক্ষ বৎসর গেলো, তবু সুন্দরী পৃথিবী তরুণী রয়েছে, কোথায়ও জরা নেই, এ অনন্তযৌবনা, নবনবসৌন্দর্য্যময়ী, প্রাণের এ নবনবলীলানিকেতনে আমার আর স্থান নেই বুঝি। কে চেয়েছিলো এ প্রাণকে? কে দিয়েছিলো এ প্রাণকে! এ প্রাণকে কে যেন আমায় পৃথিবীর কার্বার কর্বার জন্য ধার দিয়েছিলো, সে মূলধন ত সব উজাড় হয়ে গেলো, সুদও কিছু রইলো না, আজ দেউলে হয়ে প্রাণকে উড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে চাই।

একটা কালো পোকা ঘুর্তে ঘুর্তে সার্সির কাচে লেগে মরে পড়ে গেলো। ওই মরা পোকাটার দিকে চেয়ে ভাব্ছি প্রাণটা কি! যাঁকে ঈশ্বর বলে, সেই বিশ্বজীবন কি এই প্রাণ দেহে ভরে দিয়েছে, আবার আপন খুসীমত কেড়ে নেবে? এই জড়দেহের গাড়িতে শক্তির ঘোড়া

জুড়ে কি সেই আত্মা কোচম্যানের মত হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে? ছোট বেলায় সাবানের ফেনা খড়ে পুরে ফুঁ দিয়ে রঙীন বল্ করে খেল্তুম। কোন বল্টা অর্দ্ধেক হয়েই খড়ের মুখে ফাট্তো, কোনটা সবটা হয়ে ফাট্তো, কোনটা বা খানিকদূর উড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। মনে হচ্ছে এম্নি করে কে আমাদের জীবনটা নিয়ে খেলা কর্ছে, তার হাতের সব বল্ই ত ফেটে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, তবে এত রঙীন করে গড়া কেন? আত্মা আছে, তা অজর অমর, একথা অনেক বইয়ে পড়েছি, অনেকের সঙ্গে তর্ক করেও বুঝিয়েছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, হয়ত কিছুই নেই, ওটা আমাদের কল্পনার সৃষ্টি, মনকে প্রবোধ দেওয়া। তা হলে ত ওই ঘোড়া-টার, ওই আর্সোলার, ওই পোকার, ওই টিক্টিকিরও আত্মা আছে। সে-রকম আত্মা আমি চাই না, তার চেয়ে আত্মা না থাকাই আমার ভালো।

আচ্ছা, প্রকৃতির নিয়ম সহ্য করা যায়, ঈশ্বর তাকে চিরকালের জন্য বেঁধে দিয়েছেন, তার হুকুম সবাইকেই মান্তে হবে, কিন্তু এই মানুষের গড়া নিয়ম—এই সমাজের শাসন অসহ্য—এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্তে হবে।

একটা কিছু ঠিক করে ভাব্তে পার্ছি না, চিন্তাসূত্রের খেই খালি হারিয়ে যাচ্ছে।

নারীকে ভালোবাস্তে হবে অকারণে, সে সুন্দরী বলে নয়, সতী বলে নয়, বুদ্ধিমতী বা সেবিকা বলে নয়, সে নারী বলে। সেখানে কোন তর্কবিচার থাক্বে না, কোন উপমা অলঙ্কার থাক্বে না—প্রেম হবে এক দেহমন-প্রদীপে অচঞ্চল অগ্নিশিখা, নিছক মাধুর্য্য, সব ভুলে ডুবে যাওয়া—সেই প্রেমেই নারী জেগে ওঠে, সত্যিকার আনন্দ পায়।

সেই প্রেম নিয়ে তার দ্বারে পৌঁছ্লুম, কিন্তু সে ত নারী নয়, চোদ্দ বচ্ছরের সুধা—এত সরল, এত মিষ্টি—সে এ সমাজের অত্যাচারের কি

বোঝে, নারীর অধিকারের কি জানে—সে ত ভোর বেলার এক নির্ম্মল সুন্দর ফুলের কুঁড়ি, আমার প্রেমের অলোয় তার একটু রং লেগেছিলো, পাতাগুলো একটু শিউরে উঠেছিলো। যেদিন তার অন্তর রাঙা গোলাপ হয়ে ফুটবে, এই ভোরের আলোর কথা কি তার মনে থাকবে? যে যত ভালোবাসে তার দুঃখ তত বেশী—ভালো না বাসাই সবচেয়ে ভালো। আমার বয়সই বা এত কি বেশী? উনিশ। হিসাব-নিকাশ করছি না, তবু এই ছোট জীবনের জমাখরচের খাতাটা দেখছি—শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিগুলো বার বার দেখে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি—কোন পাতায় হিজিবিজি, কোথাও হিসেব মেলেনি, কোথাও একটু রঙীন ছবি আঁকা, কোন পাতায় কালো রেখা—আর শেষের এক রাশ পাতা একেবারে সাদা। আচ্ছা মৃত্যুর পর এই জীবনের খাতাখানির সব লেখা একেবারে মুছে যাবে অথবা ওই সমস্ত হিজিবিজির আশ্চর্য্য অর্থ বেরোবে? জীবনে কিছু করে যেতে পারলুম না, জীবন শেষ হয়ে আসছে, শেষের পাতাগুলো সাদাই থাকবে। সব আশা স্বপ্ন রেখে দাও, ঘন অন্ধকার নদীর তীরে এসে পৌঁছেচি, স্তব্ধ কালো জল, চারিদিকের মানুষেরা যেন ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমায় আর তাদের দরকার নেই, তাদের আর আমার দরকার নেই—আচ্ছা ওই কালো নদী পেরিয়ে কি নতুন দেশ আছে, না, জলে জল হয়ে যাবো? যদি থাকে, সে যেন পৃথিবীরই মত রূপে রসে গন্ধে ভরা প্রেমস্নিগ্ধ হয়, সেখানে যেন সাতটি রংকে পাই—আর আমার মানসীকে।

একটা ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে কারো সঙ্গে, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি দেখা পেতুম একবার মনের সাধে তর্ক করে ঝগড়া করে শান্তি পেতুম।

ঘরে হাসির ঢেউ তুলে মালতী এসে আমার গলা জড়িয়ে বল্লে,—এর একটা বিচার তুমি করে দাও দাদা। তোমার বন্ধু, হয় তিনি রাঁধুন,

নয় কবিতা লিখুন—তা নয় ভাত ডাল চড়িয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বস্‌বেন আর আমার ভাত ধরে তর্‌কারি পুড়ে যাক—

—না, দেখো বন্ধু, একটা উপমা লিখ্‌তে লিখ্‌তে কেমন একটু দেরী হয়েছিলো, তাই ভাত একটু ধরেছে—

—আচ্ছা, রান্নাঘরে আর এ খাতা নিয়ে ঢুক্‌লে আমি উনানের আগুনে দেবো বল্‌ছি—

আমি হেসে বল্লুম,—আচ্ছা first warning দিয়ে আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

আমার হাসিমুখ দেখে তুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, আচ্ছা বেশ।

ওরা ইচ্ছে করে ঝগড়া বানিয়ে খুন্‌সুটি করে আমার কাছে নালিশ কর্‌বার জন্ত ছুটে আসে—আমার মনে একটু আনন্দ দেবার জন্ত ওদের চিন্তার চেষ্টার অন্ত নেই। হায়রে, তুঃখের ভাগ কি কেউ নিতে পারে? এ মৃত্যুর পথ যে বিজন একা-চলার পথ। বন্ধু কি কর্‌তে পারে? ব্যথিত হতে পারে, সেবা কর্‌তে পারে, কিন্তু তুঃখ কমাতে পারে এমন গর্ব্ব কর্‌লে তুঃখকে অপমান করা হয়।

* * * * *

মৃত্যুটা যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, মনে হচ্ছে এ দেহ আমার দেহ নয়। এই শীর্ণ হাত জীর্ণ দেহ ছেড়ে আমি বাড়ীর চারদিকে শূন্যে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কাল সন্ধ্যেবেলায় বিনয় ঘরে ঢুকে আমায় জড়িয়ে বল্লে, বন্ধু পেয়েছি।

হেসে বল্লুম, কি পেয়েছো? তোমার কবিতার বই ছাপাবার পাব্‌লিশারকে, না আমার ছবির ক্রেতাকে?

সে বল্লে,—না হে, যখন বরাত খোলে, এম্নি হয়, একসঙ্গে তুটো মাষ্টারি, একটা চাকরি। এবার তোমার injection-এর ব্যবস্থা হচ্ছে।

বল্লুম,—হাঁ, প্লানচেটে আমার ভূতটাকে এনে তার গা ফুঁড়ে চিকিৎসা কোরো।

যাক্, এরা দুটো যে না খেতে পেয়ে মরবে না, মরার আগে এই তৃপ্তি-টুকু লাভ করলুম।

যদি আমার টাকা থাকতো, একবার দেখে নিতুম রোগটাকে—দেখে নিতুম, কে বড়—আমি, না সেই ছারপোকা, আমার দেহে যে কালাজ্বরের জীবাণু ঢুকিয়েছে সে, আমাতে আর সেই Leoishmania donovaniতে একটা রীতিমত যুদ্ধ হোত। যা নেই, তার জন্য দুঃখ করে কি হবে।

* * * *

রাতে ঘুম হয় না। এই পিতৃপিতামহদের স্মৃতিবিজড়িত পোড়ো বাড়ীখানা যেন মাঝে মাঝে কেঁদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নীচেকার বালিখসা ভাঙা ঘরগুলোর চামচিকে ইঁদুর আরসোলার রাতের উৎসব ভূতদলের নৃত্যের মত।

কাল রাতে হঠাৎ মনে হলো, মা যেন আমার মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন—আয় বাছা আয়।

জানলার দিকে চেয়ে দেখি, কৈ কেউ নেই। গির্জ্জের ঘড়িতে একটা বাজলো, লালবাড়ীটা অন্ধকার, নিঝুম। অনন্ত আকাশের এক টুকরা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—কয়েকটা তারা জ্বলছে। ওই যেন মৃত্যুসারথি তার নীহারিকায় গড়া রথ নিয়ে এসেছে, চার গ্রহ দিয়ে চার চাকা তৈরী,—Great Bear, Little Bear এর মত দুটো ঘোড়া জোতা।

উনিশ বছর আগে যেদিন সে পৃথিবীর আনন্দপুরীর পথে আমায় নামিয়ে দিয়েছিলো, সে দিন হয়ত সে হেসেছিলো, আর আমি মাটির বক্ষে পড়ে কেঁদেছিলুম। আজও তার মুখে মন-ভোলানো হাসি, কিন্তু আমার চোখ জলে ভরে আসছে যে

না, আমার মোটেই ভয় কর্‌ছে না, দুঃখ হচ্ছে না, এই ছোট পৃথিবীতে উনিশ বছরের জীবনে যদি এত রূপ এত গান এত প্রাণ অনুভব করে থাকি তবে এই নীলযবনিকার অন্তরালে যে অনন্ত জগৎ রয়েছে সেখানে কি ওর চেয়ে কম সৌন্দর্য্য কম আনন্দ পাবো, অনন্ত জীবনে কত সুধা ভরে উঠ্‌বে—

না, এসব কবিত্ব কর্‌তে ভালো লাগে না, বিদ্রোহ কর্‌তে চাই—সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের নিয়মের বিরুদ্ধে।

আচ্ছা, যদি মরি, একবার পৃথিবীটা ঘুরে গ্রহতারা দেখ্‌তে বেরোব। একটা জ্বালা, অশান্তি, কিছুতেই দূর হচ্ছে না। বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে আল্‌প্‌সের চূড়ায় বসে কাঞ্চনজঙ্ঘায় অরুণোদয়ের আভা মেখে প্যাসিফিকের এক টাইফুনে দুলে আট্‌লান্টিকের এক সাইক্লোনে গান গেয়ে সুমেরুর এক তুষার ঝাপ্‌টায় জয়ধ্বনি তুলে আর সবশেষে একবার জ্যোৎস্নালোকে সুধার বিছানায় তাকে দেখে চলে যাবো অনন্ত যাত্রায়—

কালো গলিটা করুণ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরে, তোর বুকের উপর দিয়ে শ্রাবণের ধারা ঝরা এবার শেষ হবে, শরতের আলো এসে পড়্‌বে, বসন্ত চঞ্চল চরণে চলে যাবে—ছয়ঋতুর রঙ্গীন উত্তরীয় এখানে একটু লুটিয়ে যাবে। এই পথ দিয়ে যদি কোন গভীর স্তব্ধরাতে আমার মৃতদেহ নিয়ে যায়, তার জন্যে এত দুঃখ কি? একদিন ত এই পথ দিয়েই আলো জ্বালিয়ে গীত-উৎসবে বিবাহের বর এসেছিলো। আবার এই পথ দিয়েই সেই নববধূ কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীবেশে ফিরে আস্‌বে।

অবসাদ আসে, শূন্যতা, ব্যর্থতা। এ কিসের দুঃখ? মনে হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির মর্ম্মস্থলে কিসের বেদনা আছে, তৃপ্তি কিছুতেই হচ্ছে না।

জগৎস্রষ্টা নিছক আনন্দে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন নি, তাঁর বুকের মধ্যে কি অভাব ব্যথা রয়েছে। কিসের জন্য আমার তৃষ্ণা ? প্রেমের জন্য ? সুখের জন্য ? জীবনের জন্য ? বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ক্ষুধিত বন্যজন্তু যেমন শিকারের সন্ধানে মত্ত হয়ে ঘোরে তেম্নি আমার মনে কে চাই চাই বলে কেঁদে ফির্‌ছে। ঈশ্বর কাকে বলে, জানি না, এই বেদনা এই কান্নাই আমার কাছে দেবতা ; তাকে আমি পূজা কর্‌তে, তার পায়ে জীবন-শক্তির নৈবেদ্য এনে দিতে চাই।

কিন্তু এ জীবনে আর যে কিছু দেবার নেই প্রভু, এ মরণের পর যা থাকে তোমায় দিলাম।

একটা ছবি আঁক্‌বো ভাব্‌ছি। মৃত্যু প্রিয়ার মত আমার মাথার গোড়ায় এসে এ শীর্ণ মুখে জীর্ণ কপালে রক্তহীন অধরে জ্যোতিহারা চোখে চুমো খেয়ে শ্রাবণমেঘের মত তার কেশভারে জীর্ণদেহ ঢেকে নীহারিকার মত শুভ্র তরীতে তুলে নিয়ে চলেছে—কালো যমুনা-জলের মত তার রং, বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল তার আঁখি, জ্যোৎস্নাধৌত সুনীল পালে উষা-অরুণ-মণ্ডিত হাল ধরে লক্ষ-তারা-ছড়ানো অনন্ত সাগর দিয়ে তরী ভাসিয়ে চলেছে—রোগজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নবকলেবর ধারণ করে অনন্ত জীবনস্রোতে ভেসে চলেছি।

হাতটা বড় কাঁপ্‌ছে, আঁক্‌তে কিছুতেই পার্‌ছি না, আঁক্‌তে আর চাই না—চোখে সব রং গুলিয়ে আসে।

কিন্তু এই কালো গলির ভাঙা বাড়ীতে ড্রেনে-পচা ইঁদুরের মত মর্‌তে ইচ্ছে করে না—

ইচ্ছে কর্‌ছে, যখন একে একে তারা মিলিয়ে যাচ্ছে, শরতের উষার আকাশ থেকে সোনা গলে গলে পড়্‌ছে, সেই রাত্রিদিনের সন্ধিক্ষণে উন্মুক্ত আকাশের তলায়, জলভরা নদীর তীরে কাশবন শেফালীবনের পাশে,

ধানেভরা ক্ষেতের সাম্‌নে শিশির-ভেজা ঘাসে শুয়ে প্রভাত-পাখীর প্রথম গানের পূর্ব্বে পৃথিবীর শেষ নিশ্বাস ফেলি।

আঁকাবাঁকা কালো গলিটা করুণ নয়নে তাকিয়ে বল্‌ছে—হাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে করে, এই ইটের বাড়ীস্তূপের বাঁধন ছিঁড়ে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে খোলা মাঠ পার হয়ে, শেফালীবনের পাশে নদীর খেয়াঘাটে গিয়ে পড়ি।



রেবতী

রেবতী

যুবকটির কালো জ্বলজ্বলে চোখ-দুইটির দৃষ্টিতে সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম, যুবকটি বলিতে আরম্ভ করিল—

কয়েক বৎসর আগে এই মেডিকেল-কলেজে রেবতী বলিয়া একটি ছেলে পড়িত। ছেলেটি যেমন সুপুরুষ তেমি সৌখীন ছিল। থার্ড-ইয়ার পাশ করিয়া যখন ফোর্থ-ইয়ারে উঠিল, কলেজের প্রায় সব নার্সের সহিত তাহার আলাপ হইল। হাস্‌ছেন?—বাস্তবিক সে নার্সদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখিত, এই যে তরুণীরা দিনরাত অজানা রোগীদিগকে মা-বোনের মত সেবা করিতেছে, তাহা দেখিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। ইচ্ছা করিলেই সে সুন্দরী নার্সদের সঙ্গে খুব ভাব করিতে পারিত, কিন্তু সব-সময়ে সে সসম্মানে দূরে থাকিত।

হাঁস্পাতালে ঢুকিয়াই একটি নার্সকে তাহার বড় ভালো লাগিল। সে দেখিতে খুব ফর্সা ছিল না কিন্তু তাহার চোখে মুখে খুব উজ্জ্বলতা স্নিগ্ধতা ছিল, যেন সে পল্লী-কুটীরের একটি মেয়ে। হাস্‌ছেন?—সত্যি বল্‌ছি তার এই ভালো লাগার মধ্যে একটুও লালসা ছিল না। যদি সে তাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে কোথাও দেখিত, সে নিশ্চয় ডাকিয়া বলিত, তুমি আমার বোন, আমায় তুমি দাদা বলে ডাকবে।

নার্স লি—র চোখ-দু'টির দিকে চাহিলেই মনে হইত যেন সে নিশীথের নিরন্ধ্র অন্ধকারে শূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কত রাত্রি কাটাইয়াছে; কিন্তু নয়নের সেই অন্ধকার দীঘির জলের মত স্নিগ্ধ হইলেও বিদ্যুদ্‌গর্ভ। সে বড় কাহারও সহিত মিশিত না, অন্য নার্সদের সঙ্গে গল্প করিত না; যতক্ষণ হাঁস্পাতালে কাজে থাকিত তাহার মুখে কি প্রসন্নতা আনন্দের হাসি

মাখানো থাকিত কিন্তু হাঁস্পাতালের বাহির হইলেই সে যেন তাপদগ্ধ লতার মত নুইয়া পড়িত। রোজ সন্ধ্যাবেলায় টেনিস খেলিয়া রেবতী যখন নার্সদের বাড়ীর সম্মুখ-পথ দিয়া বাড়ী ফিরিত, প্রায়ই দেখিত নার্স লি— চুপ করিয়া তেতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার সময় অনেক নার্সের নিকট অনেক বন্ধু আসিয়া গল্প করিত, বেড়াইতে লইয়া যাইত, কিন্তু নার্স লি—র নিকট কোন বন্ধু আসিত না, নূতন কোন লোক বন্ধুত্ব করিতে চেষ্টা করিলে প্রশ্রয় পাইত না। বিকালে ছুটি পাইলে প্রায়ই সে বেড়াইতে বাহির হইত না, কোন কোন মেঘ্‌লা সন্ধ্যায় একলা বাহির হইত। রেবতী লুকাইয়া খোঁজ লইয়া জানিয়াছিল, তাহার নামে কোন চিঠি আসে না, সেও কাহাকে চিঠি লেখে না। নার্সটির বিষয়ে কত কথা সে ভাবিত, এর জীবন সজল অন্ধকারের মত অশ্রুঘন রহস্যে ঘেরা, ইহার জীবনের সহিত কাহারও দুঃখের পাপের ইতিহাস জড়ানো। আসল কথা—নার্সটিকে সে একটু ভালোবাসিয়াছিল। হাস্‌ছেন ?—দেখুন, একটি যুবতীর প্রতি এক যুবকের মনের ভাব বলা শক্ত। রেবতীর ভালোবাসায় স্নেহ ছিল, করুণা ছিল, হয়ত একটু কামনাও ছিল। যাক্ গল্পটা বলি।

রেবতী অনেক কষ্ট করিয়া নার্সটির সহিত একটু ভাব করিল। ধীরে ধীরে ভাব জমিয়া আসিতে লাগিল; কেমন করিয়া দুইজনের মধ্যে ভাব হইয়া গেল তাহা দেখিয়া দুইজনেই অবাক্ হইল। মাঝে মাঝে আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ ও রোগীদের পথ্যের অল্পতা সম্বন্ধে বলিতে বলিতে দু-একটি মনের কথাও বলিয়া ফেলিত। নার্স লি— যে কোন যুবকের সহিত আলাপ করিতেছে দেখিয়া হাঁস্পাতালের সবাই অবাক্ হইল।

নার্সটিকে রেবতীর দিন দিন খুবই ভালো লাগিতে লাগিল। রেবতীর মনে হইত, অন্য সব নার্স কর্ত্তব্যের অনুরোধে কাজ করে, কিন্তু তাহার

নার্স প্রাণের প্রেরণায় সেবা করে, তাহার অন্তর হইতে করুণার উৎস অনুক্ষণ উৎসারিত হইতেছে। অন্যের কাছে রোগী সেবা একটা বাহিরের কাজ, কিন্তু নার্স লি—র কাছে এই রোগী-শুশ্রুষা তাহার প্রাণের আহার, এ কাজ একদিন বন্ধ করিলে সে যেন মরিয়া যাইবে।

একদিন রেবতী মোটর চালাইয়া ধর্ম্মতলা দিয়া যাইতেছে, দেখিল ফুট-পাথ দিয়া নার্স লি— কি একটা জিনিষ লইয়া একা চলিয়াছে। মোটর থামাইয়া নার্সের কাছে গিয়া রেবতী বলিল, চলো নার্স তোমায় হাঁস্পাতালে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নার্সের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ভীত-করুণ-নয়নে চাহিয়া বলিল,—না, না, সে কিছুতেই হতে পারে না। তারপর সম্মুখে এক দোকানে ঢুকিয়া রেবতীর সম্মুখ হইতে পালাইল।

রেবতীর ভারি ইচ্ছা করিত নার্সকে কিছু সাহায্য করে, কিছু উপহার দিয়া তাহাকে খুসি করে। কিন্তু নার্স যে কিছুতেই লইবে না, তাহা সে জানিত। একদিন সে মিনতির স্বরে বলিল, দেখো নার্স, তোমাকে একটা বেড়াতে যাবার পোষাক উপহার দেবো, তোমায় নিতেই হবে! সত্যই নার্সের কোন ভাল ইভনিং ড্রেস ছিল না।

না, না, সে অসম্ভব, বলিয়া নার্স আর একটি রোগীর বেডের নিকট পালাইল।

আর একদিন নার্স একটি ছোট ছেলেকে মাতার মত আদর করি-তেছে, রেবতী পাশে আসিয়া ধীরস্বরে বলিল, তুমি দিন দিন রোগা হোচ্ছ, তোমার একটু বেড়াতে যাওয়া দরকার, আমার সোফারকে দিয়ে মোটর পাঠিয়ে দেবো, তুমি বিকেলে ছুটি পেলে বেড়াতে যেও।

নার্স চুপ করিয়া ঔষধ ঢালিতেছিল, রাগিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

রেবতী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা, আমাকে তুমি তোমার বন্ধু বলে মনে করো, তোমার আপন ভাই থাক্‌লে সেও ত' তোমায় এই কথাই বল্‌তো—

নার্সের চোখ-দুটি ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল, একসঙ্গে তিন দাগ ঔষধ ঢালিয়া ফেলিয়াছিল, দুই দাগ শিশিতে ঢালিয়া নীরবে ছেলেটিকে ঔষধ খাওয়াইল।

সে রাতে রেবতী যখন হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইতেছে, সহসা নির্জ্জন গেটের সাম্‌নে নার্স আসিয়া তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইল। নতমুখে কাতরকণ্ঠে বলিল, দ্যাখো, আমি বড় দুঃখী। দুঃখীজনকে ভালো-বাস্‌লে দুঃখ বেড়েই যায়—কেন তুমি আমায় বন্ধুর মত ভালোবাস্‌তে চাও? কথাগুলি কোনমতে বলিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সে ছুটিয়া পালাইল।

ইহার পর হইতে মাঝে মাঝে রেবতী নার্সকে লইয়া মোটরে বেড়াইতে যাইত। থিয়েটারে, বায়স্কোপে, ইডেন্‌গার্ডেনেও লইয়া যাইত।

হাস্‌ছেন?—হাস্থন—এসব আপনারা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। রেবতী শীঘ্রই বুঝিল—এই প্রেম এই আদর নার্সকে বেদনা দিতেছে। সে কোথাও যাইতে বা কোনো উপহার গ্রহণ করিতে শুধু সঙ্কুচিত নয় ব্যথিত হয়। অথচ এর কারণও জিজ্ঞাসা করা যায় না।

একদিন সে বলিল, দেখ নার্স, তোমার যখন যা দর্‌কার হবে, যেখানে যখন বেড়াতে ইচ্ছে কর্‌বে আমায় বোলো, আমার ইচ্ছামত তোমায় আমি কিছু দেবো বা বেড়াতে নিয়ে যাবো এ আমি মোটেই চাই না।

নার্স মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা বন্ধু, আচ্ছা।

তারপর সেই রাত আসিল।

যুবকটি যেন শিহরিয়া উঠিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিল। অর্দ্ধদগ্ধ সিগার না ধরাইয়াই মুখে পুরিয়া টানিল। সমস্ত ঘর স্তব্ধ; তাহার চোখের তরবারির ঝলকের মত খরদৃষ্টি আগুনের ভাঁটার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। ধীরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

সে রাতে নিশ্চয় চন্দ্র-গ্রহ-তারা কি চক্রান্ত করিয়াছিল, মাটি-জল-হাওয়া কি ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছিল, বায়স্কোপের ফিল্ম্ মোটর-গাড়ীর কল কলিকাতার পথগুলিও সেই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল।

অনেকদিন পরে রেবতী নার্সকে লইয়া বায়স্কোপে গেল। নার্সের পাশে বসিতেই কি মোহে তাহার সর্ব্বদেহ আচ্ছন্ন হইল, সিনেমা-হাউসের অন্ধকার আলো, সম্মুখে ছায়াছবির খেলা, সব মিলিয়া কি মোহজাল রচনা করিল। তাহার সকল শিরা-উপশিরায় রক্ত কেন বারম্বার ঝিল্‌মিল করিয়া উঠিল, সে বুঝিতে পারিল না। অন্তরে কোথায় যেন কি চাপা ছিল, সহসা অগ্ন্যুৎপাত হইয়া চারিদিক্ আগুনে ধোঁয়ায় ছাইয়া গেল। কি ছবি দেখানো হইতেছে, গল্পটা কি, এসব যেন সে কিছুই বুঝিতেছিল না, কেবল এক বিরাট অসহনীয় আনন্দময় অনুভূতিতে দেহমন আচ্ছন্ন হইয়া গেল—সে নার্সের পাশে বসিয়া আছে।

বায়স্কোপ-শেষে যখন দুইজনে মোটরে চড়িল, সম্মুখে বিশাল ময়দানে দক্ষিণ বাতাস ও জ্যোৎস্নালোক মিলিয়া কি অপূর্ব্ব মায়াজগৎ সৃজন করিয়াছে। কালো গাছের সারির মধ্যে হীরার মত আলোর মালা। সে রাতে নার্সেরও কি হইয়াছিল। রেবতী যখন সেই আলোছায়াঘন রহস্যময় মায়ারাজ্যের দিকে মোটর ছুটাইল, সেও ত বারণ করিল না। তাহার ঘনকালো চোখে আজ কি বিদ্যুৎ-উৎসব, তাহার মলিনমুখে কি

অরুণজ্যোতি-লীলা। আজ তাহাদের দেহমন কোন্ মায়াবিনী মন্ত্র পড়িয়া উন্মত্ত করিয়া দিয়াছে। প্রিয়া-গৃহ-যাত্রী প্রেমিকের মত মোটরটা আনন্দ, আশঙ্কা, আবেগে দুলিয়া দুলিয়া সেই স্নিগ্ধতরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পবনচঞ্চল জ্যোৎস্নামায়ালোকের দিকে ছুটিয়া চলিল।

রাত বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; সম্মুখে দীর্ঘপথ জনহীন, স্তব্ধ; দুইধারে গ্যাসের পোষ্টগুলি নিস্তব্ধ প্রহরীর মত আলোকমালা জ্বালাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন গভীর নিশীথে কে মহাসমারোহে আসিবে তাহার আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

মধুযামিনী-শেষে অভিসারিকার মত মোটরটি চঞ্চল-চরণে ক্লান্তনয়নে শূন্যপথ দিয়া সুখহীন গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে; এককোণে এক তরুণী—বিপর্য্যস্ত কেশ, এলায়িত তনু, করুণ আনন; অপর কোণে এক যুবক মড়ার মত অসাড় হইয়া steering wheel-এ হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া, মোটর আপনিই চলিয়াছে।

অনন্তপ্রসারিত অন্ধকার পথ দিয়া কোনো ভীষণ দৈত্য হুঙ্কার করিতে করিতে দুইটি ভীত ব্যথিত যুবক-যুবতীকে বুকে করিয়া কোন্ অজানা উদ্দেশ্যে লইয়া ছুটিয়াছে, আর পথের মাঝে কাহারা অগ্নি-উজ্জ্বল-নয়নে তাকাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে।

অনেক দূরে ভূতের মত কাহার কালো ছায়া দেখা গেল, সহসা সে কৃষ্ণমূর্ত্তি কোথায় মিলাইয়া গেল; আবার সে মূর্ত্তি দেখা গেল, আবার মিলাইল; হঠাৎ মোটরটা ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া শিকারের সন্ধানে সেই মূর্ত্তির পিছন পিছন ছুটিল।

সে নিকষ-কৃষ্ণ মূর্ত্তি ঠিক্ মোটরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল; যেন তাহার সহিত লড়াই করিবে, একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে। সে

মূর্ত্তি ত এতক্ষণ সম্মুখে কোথাও ছিল না, নিশ্চয় সে পথের কালো পিচ ভেদ করিয়া সহরের অন্ধকার ড্রেন হইতে উঠিয়া আসিতেছে। রেবতী steering wheel ঘুরাইল। আমি সত্য বলিতেছি, আমায় বিশ্বাস করুন, রেবতী বামের দিকে মোটর ঘুরাইল, কিন্তু মোটর কোনোমতেই ঘুরিতে চাহিল না, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত মোটরটা ভূতের মত কালো মানুষটার ঘাড়ে লাফাইয়া গিয়া পড়িল; তাহার বুকের উপর পড়িয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রক্ত পান করিতে করিতে কোনো প্রতিহিংসার জ্বালা দূর করিতে লাগিল।

দীর্ঘ কালো পথের বুক ভেদিয়া এক করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া সমস্ত বায়ুস্তরে ছড়াইয়া গেল, যেন নগরের অন্তস্তল হইতে সে কান্না উঠিতেছে। গ্যাসের আলোগুলি সজল চোখের কম্পনের মত শিহরিয়া উঠিল—আহা আহা! মুকুলিত বৃক্ষশাখা দোলাইয়া সুপ্ত প্রাসাদশ্রেণী কাঁপাইয়া বসন্ত-বাতাস বহিয়া গেল—হায় হায়!

হিংস্র জন্তু যেমন শিকার বধ করিয়া গহ্বরের দিকে বহন করিয়া লইয়া যায়, মোটরটি তেম্নি সেই অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ তুলিয়া লইয়া আবার ছুটিল। এক পাশে মূর্চ্ছিতা নারী; মধ্যে আহত শিকার, কাশগুচ্ছের মত শ্বেতকেশের উপর উপলমণির মত রক্তবিন্দু জ্যোৎস্নালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, অপর পাশে শবের মত অসাড় যুবক বসিয়া মোটর চালাইবার বৃথা ভান করিতেছে, মোটর কিন্তু রক্তপান করিয়া তীব্র সুখে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

অন্ধকার আকাশের মত অন্তহীন পথ দিয়া লৌহরথ ছুটিতেছে, এক পাশে নির্য্যাতনক্ষুব্ধা বুভুক্ষিতা অশ্রুসিক্তা নারী, অপর দিকে শক্তি-ক্ষিপ্ত প্রেমতৃষিত চিন্তামগ্ন পুরুষ, মধ্যে রক্তমাখা কালো শব মৃত্যুর রূপ ধরিয়া লৌহরথ হাঁকাইতেছে। পথের আঁকে বাঁকে গ্রহতারার

মত গ্যাসগুলি চাহিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে,—কোথায় ?—কোথায় ?

তিন বছর আগে ঠিক্ এম্নি জ্যোৎস্নারাতে ওই এমার্‌জেন্সি-রুমে রেবতী এক মাতাল ফিরিঙ্গি সাহেবের রক্তাক্ত দেহ বহন করিয়া আনিয়াছিল। সাহেবটি সে রাতেই মারা গেল।

যুবকটি একটু থামিয়া একবার সিগার টানিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন সকালে রেবতী যখন মোটর বাহির করিয়া চালাইতে গেল, হঠাৎ কিসের শব্দে তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল ; ঠেলা দিতেই মোটরখানি অস্বাভাবিক চীৎকার করিতেছে। না, এ ত ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ নয়, এ যে সেই বুড়ো সাহেবটার করুণ আর্ত্তনাদ, মোটরের লোহার বক্ষ ভরিয়া সেই কাতরধ্বনি পোরা রহিয়াছে, একটু নাড়া দিলেই সেই ধ্বনি চারিদিক্ আকুল করিয়া বাজিয়া ওঠে। পেট্রোল ঢালিতে গিয়া রেবতী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। আর মোটর চালাইতে পেট্রোলের দর্‌কার হইবে না, পেট্রোলের পাত্র রক্তে কানায় কানায় ভরা, এ নররক্তে মোটর হাঁকাইয়া পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত—মৃত্যুরাজ্যের দুয়ার পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। রেবতী অসাড় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; সহসা মোটরের বুক ফাটিয়া কান্না থামিয়া গেল, একটা বিদ্রূপের হাসি উঠিল ; সেই বুড়োটা যেন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে—কেমন ! কেমন !

রেবতী দৌড়িয়া পালাইল।

সারাদিন একা ঘরে কাটাইল। সন্ধ্যায় শঙ্কিতপদে কম্পিতবক্ষে গ্যারেজে ঢুকিতেই আবার সেই আর্ত্তনাদ, বিদ্রূপের হাসি ! রেবতী মূর্চ্ছিতের মত টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল।

ভূতের মত পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে কলেজে আসিয়া পৌছিল, তখন গভীর রাত্রি. চারিদিক্ স্তব্ধ, আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না।

রেবতী গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কলেজে ঢুকিতে পা সরিতেছে না; কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল জানি না, সহসা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, মূর্তিমতী ব্যথার মত সম্মুখে নার্স লি— দাঁড়াইয়া, ধূমমেখলা অগ্নিকুণ্ডের মত চোখ-দুইটি জ্বলজ্বল্ করিতেছে। সে আসিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া শুধু হিমস্পর্শে রেবতীর একটি হাত ধরিল।

ভয়বিজড়িত ধীরস্বরে বলিল, সে এসেছিলো!

কে?

যাকে তুমি কাল মোটরে চাপা দিয়েছিলে।

সে সাহেবটা ত কাল রাত্রেই মরে গেছে।

হাঁ, কিছুক্ষণ আগে ওই মর্গের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিলুম, মর্গ্ থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো, কি করুণ নয়নে তাকালে; বল্লুম, কেন আমায় এত ভয় দেখাচ্ছ? একটা প্রচণ্ড হাসি হেসে সে মিশিয়ে গেলো —জানো?—ও আমার বাবা—

তোমার বাবা!—

হাঁ, আমার আপন বাবা নয়, মার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি, তবু আমার বাবা!

ওঃ!—রেবতী ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া উঠিল।

নার্স সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুষ্ক স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আর দেখা কর্‌তে চেষ্টা করো না, পাবেও না—কালই আমি চলে যাচ্ছি—

রেবতী অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নার্স ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিল

জানো রেবতী, আমিও একদিন একজনকে ভালোবেসেছিলুম, সেও আমায় ভালোবাস্‌তো—আমাদের বিয়ের সব টিক্‌ঠাক্ ; এমন সময় মা পাগল হয়ে গেলো—আমার জন্মের সব কথা বলে ফেল্লে—উঃ!—সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো—সে রাতে ভেবেছিলুম যদি সত্যিকার বাবাকে পাই ত খুন করি—তাই সত্যি হোলো—ওঃ!—ওই পায়ের শব্দ শুন্‌ছো না ? ওই যে আস্‌ছে!—ওই!—

আর্ত্তনাদ করিয়া রেবতী বলিল, লিলি!—আর কিছু মুখে আসিল না। নার্স তখন শীতক্লিষ্টের মত কাঁপিতেছে। দক্ষিণ বাতাসে কয়েকটি পাতা ঝরিয়া পড়িল, একদল কাক প্রভাত হইল ভাবিয়া ডাকিয়া উড়িয়া গেল, একটা মোটর স্তব্ধ পথ কাঁপাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে শুষ্ক বিকৃতকণ্ঠে নার্স বলিল, গুড্‌নাইট্ বন্ধু—

রেবতী তাহার শুষ্ক মুখের দিকে ভীতলজ্জিত করুণ-নয়নে চাহিল ; কি বলিতে যাইতেছিল, গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কম্পিত হাতখানি দিয়া নার্সের শীতল হাত মুহূর্ত্তের জন্য ধরিয়া যেন কিসের ভয়ে ছাড়িয়া দিল। নার্স আর তাহার দিকে তাকাইল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। রেবতী ভাবিল তাহার পিছন পিছন গিয়া তাহাকে ধরিয়া ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে ; কিন্তু পা-দুইটিকে কে যেন পেরেক মারিয়া মাটির সহিত পুতিয়া দিয়াছে।

নার্স অদৃশ্য হইলে বহুকষ্টে পা-দুইটি টানিয়া টানিয়া একটু অগ্রসর হইল, কিন্তু মর্গের নিকট আসিতেই পা আর নড়িল না। ওই, ওই ত সে মর্গের দরজায় দাঁড়াইয়া—সত্যই রেবতী দেখিতে পাইল, সেই কালো সার্জ্জের সুট্ পরা রক্তমাখা বৃদ্ধ সাহেবটা মর্গের দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়াই অসমভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে রক্তের ধারা গলিত স্বর্ণের মত ঝল্‌মল্

করিতেছে; সহসা সে দাঁড়াইয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে বিদ্রূপের হাসি সমস্ত বাতাসে ছড়াইয়া গেল; হাসির সঙ্গে সঙ্গে মর্গের ঘর ভরিয়া প্রেতলোকের ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। আমি সত্য বলিতেছি, রেবতী শুনিতে পাইল, সেই ভূতটা বিকট দন্ত বাহির করিয়া বলিতেছে, কেমন! কেমন!—আর মর্গের ভিতরের প্রেত-লোকের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া তাল দিতেছে—বায়স্কোপ! বায়স্কোপ! —সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, হাড়ের খটাখট্ শব্দে ঘর আকুল। মর্গে যত দেহ ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, একদল কঙ্কাল হাত-ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে, অপর দল গানের আসর জমাইয়া বসিয়া আছে। সহসা সেই দলপতি ভূতটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—লিলি! লিলি!—আর কঙ্কালগুলি খটাখট্ শব্দে তাল দিল—মোটরকার! মোটরকার!

রেবতীর মাথার রক্ত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল উল্কার মত দুটো চোখ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। অজ্ঞান হইয়া পথের ধূলায় সে লুটাইয়া পড়িল।

যখন জাগিল, এক পুলিস রুলের গুঁতায় তাহাকে ঠেলা দিয়া উঠাই-তেছে, মাতাল ভাবিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতেছে।

তার পরদিন হইতে সেই নার্সকে বা রেবতীকে কলেজে কেহ দেখে নাই। মোটরময় সহরে থাকা রেবতীর সহিল না, কোন্ নিরুদ্দেশে সে চলিয়া গেল। জীবনে আর সে কখনও কোনো নারীকে ভালোবাসিতে পারিবে না, জীবনে আর সে কখনও মোটর চড়িতে পারিবে না।

শেষের কথাগুলি করুণ কান্নার সুরে বলিয়া যুবকটি চুপ্ করিল।

সকলে স্তব্ধ হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। ধোঁওয়ায় ধোঁওয়ায় সমস্ত ঘর ধূসর হইয়া গেছে।

আমি উৎসুক হইয়া বলিলাম, গল্পটা সত্যি মশাই?

ধীরে যেন কোন্ সুদূর লোক হইতে উত্তর আসিল, আমারই নাম রেবতীমোহন।

সকলে হেলান দিয়া শুইয়াছিল—উত্তর শুনিয়াই খাড়া হইয়া বসিল। ঠিক সেই সময়েই এমারজেন্সী রুম হইতে ডাক আসিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুলাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, কৈ হে রেবতীমোহন চক্ষের নিমেষে কোথায় সর্‌লো!

ললিত বলিল, আমার ত মনে হয় ও কখনও সত্যি রেবতী নয়।

আমি বক্র হাসিয়া বলিলাম,আমি ঠিক বলতে পারি, সত্যিকার রেবতীমোহন সেই নার্সটিকে নিয়ে কোন দূরদেশে পালিয়ে বাস করছে।

———

রতন

রতন

পেয়ালার চা নাড়িতে-নাড়িতে খবরের কাগজখানি পড়া প্রায় শেষ হইয়া গেল,—বুলু এখনও আসিয়া হাজির হইল না। আমার এই পাঁচ বছর বয়সের ভাইঝিটির সঙ্গে প্রতি সকালে একসঙ্গে চা খাওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, খাইতেও সাহস হইল না; তাহাকে ফেলিয়া চা খাইয়াছি,—সে আসিয়া দেখিলে মহামুস্কিল বাধাইবে। বায়স্কোপের বিজ্ঞাপনগুলি আর একবার দেখিয়া, কাগজখানি রাখিয়া, তাহার সন্ধানে বাহির হইতেই দেখি, বুলু বারান্দার কোণে অতি উৎসুক ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে প্রথম দু'বার ডাকিতে কোন সাড়া মিলিল না। তৃতীয়বার জোরে ডাকিয়া বলিলাম, বুলু চা খাবি নি?

না, বলিয়া সে চঞ্চলা হইয়া বারান্দার রেলিংএ মুখ ঠেকাইয়া দাঁড়াইল। কাছে গিয়ে কোঁকড়া চুলগুলিতে হাত দিয়া বলিলাম, কি হল!

দেখ কাকা, কি সুন্দর!

কি?

ওই যে ঘোড়া—fine—আমি চড়ব!

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই; বুলু বলিতে লক্ষ্য হইল। চৌধুরীদের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে একটি তেজী ঘোড়াকে দুইজন সহিস ধরিয়া রহিয়াছে। চৌধুরীদের বড়বাবু তাঁর তোষামোদীবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। ঘোড়ার দালালটি হাত-মুখ নাড়িয়া দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার বক্তৃতায় সম্পূর্ণ অসন্তোষ জানাইয়া ঘোড়াটি মাঝে-মাঝে একটু লাফাইয়া উঠিয়া পা ছুঁড়িতেছে।

ঘোড়াটি সত্যই সুন্দর,—আকৃতিতে বৃহৎ না হইলেও, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গীতে তেজ ও স্বাধীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখটি লোহার জালতি দিয়া ঢাকা,—নতুন আমদানী, এখনও ভাল দুরস্ত হয় নাই। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং; তাহার ওপর প্রভাতের আলো ঝিকমিক করিতেছে। সবচেয়ে সুন্দর তাহার লম্বা ঘাড় ও পা,—গতি ও ক্ষিপ্রতার মূর্ত্তি।

Fine, নয় বুলু?

Fineই ত, বলিয়া সে বিমুগ্ধ নেত্রে ঘোড়াটিকে দেখিতে লাগিল।

দালালটির স্তুতি-গানে ঘোড়াটি একটু চঞ্চল হইয়া লাফাইয়া উঠিল। বুলুও পা নাচাইয়া, চোখ জ্বলজ্বল করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ঘোড়া, এই ঘোড়া!

বুলুর স্নিগ্ধ স্বরে ঘোড়াটি শান্ত হইয়া বারান্দার দিকে চাহিল। ঘোড়ার চোখ যে এত সুন্দর হইতে পারে, আমি কখনও ভাবি নাই। তাহার দীর্ঘ কালো চোখ এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্ন ভরা ছিল, যেন কোন সুখ-অতীতের স্মৃতির মায়ায় মলিন ছিল, বুলুর দিকে চাহিতেই চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। লোহার জালতিটিকে ঝাঁকুনি দিয়া ঘোড়াটি ডাকিয়া আনন্দ-সম্ভাষণ করিল। তার পর লাগামটি দাঁতে চিবাইয়া, বুলুর দিকে চাহিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। সে চাহনি যেমন উজ্জ্বল, তেম্নি করুণ। খাঁচায়-পোরা বনের পাখীর মত তার চোখ দুইটি। সেই চোখের ওপর কত উন্মুক্ত প্রান্তর, কত স্নিগ্ধ অরণ্য, অষ্ট্রেলিয়ার বনে স্বাধীনমুক্ত, উল্লাসময় জীবনের কত ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে; এই প্রাষাণ-পুরীর বক্র, সঙ্কীর্ণ পথ,—এই কারাগারের প্রাচীরের মত প্রাসাদ-শ্রেণী,—এই মুখে, পায়ে দাসত্ব-বন্ধনের প্রতি সে করুণ ভাবে চাহিতেছে।

সেদিন সকালটি ঘোড়া দেখিতে-দেখিতেই কাটিয়া গেল,—সত্যই আর কাহারও চা খাওয়া হইল না।

বিকেলে আসিয়া বুলুকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার আসার শব্দ পাইতেই সে ছুটিয়া আসে,—আমার ঘরই তাহার খেলার আড্ডা। কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে ভাবিয়া, জলখাবার খাইয়া, একটা মিহিদানা তাহার জন্য রাখিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় নৃত্যময়ী হাসির মত বুলু আসিয়া হাজির হইল।

কোথায় গেছ্‌লি?

কেন, রতনের কাছে।

রতন কে?

রতন গো, কি fine!

Fine বলিতেই বুঝিলাম। বলিলাম, ওই ঘোড়াটা বুঝি?

হাঁ গো! বাবা, আমি আর বোঝাতে পারি না।

ওর নাম রতন বুঝি?

হাঁ, আমি নাম রেখেছি যে—দেখ, কাকা, কি সুন্দর ওর চুল! ঘোড়ার ঘাড়ের একগোছা অতি মসৃণ সোনালী চুল, এতক্ষণ সে হাতটি ফ্রকের ভিতর রাখিয়া, লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

দেখ্‌, ওগুলো আমার কাছে রেখে দে, তোর মা দেখলে তোকে খেয়ে ফেলবে।

বা, সেদিন ত মা'র চুল আমি কেটে নিয়েছিলুম, মা বুঝি খেয়ে ফেল্লে!

আচ্ছা, মা'র চুল ভাল, না এ চুল ভাল?

তা আমি বলব না!

চুলগুলি দোলাইতে-দোলাইতে মা'কে দেখাইবার জন্য অন্দরে

ছুটিয়াছে দেখিয়া আটকাইলাম। ওগুলি লইয়া গেলে মহাবিভ্রাট হইবে,—ঠাকুমা এই সন্ধ্যায় নাৎনীর স্নানের ব্যবস্থা দিতে পারেন। মিহিদানার লোভ দেখাইয়া তাহাকে আবার ঘরে আনিলাম। মিহিদানাটি খাওয়াইতে-খাওয়াইতে বলিলাম, তোর সে ঘোড়াটা কোথায়,—তার ঘাড়ে এগুলো লাগালে ভারি সুন্দর দেখাবে। তাহার একটি বড় কাঠের ঘোড়া আমার ঘরের কোণে ছিল,—সেটি অবশ্য আমারই ঘুস।

অন্য সময় সে ঘোড়া চক্ষের আড়াল হইলে সে বিষম চঞ্চল, শঙ্কিত হইয়া উঠিত; এখন অতি শান্ত ভাবে বলিল, ও, সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি।

দিয়ে দিয়েছিস? কাকে? সহসা তাহার এরূপ ঔদার্য্য ও স্বার্থহীন দানে অবাক্ হইলাম।

সে আমি মুলুকে দিয়ে দিয়েছি,—ওর ত আর রতন নেই, ও গিয়ে ত রতনকে দেখতে পারে না!

বেচারা?

হাঁ, বেচারাই ত, ওকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

ক'দিনের জন্যে?

ক'দিনের জন্যে কি? একেবারে।

পরদিন সকালে বুলু চা খাইতে আসিল বটে, কিন্তু সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল,—যেন মহা সমস্যায় মগ্ন। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কাকা, রতন চা খায়? কোন ঘোড়াকে কখনও চা খাইতে দেখি নাই;—বলিয়া ফেলিলাম, না। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বুলু বলিয়া উঠিল, তুমি জান না, ও খায়। বল, খায়।

মানিয়া লইতে হইল, ঘোড়ায় চা খায়। চা খাওয়া শেষ হইতেই সে নিমেষে কোথায় সরিয়া পড়িল।

একটু পরে বুলুর মার অতি অস্বাভাবিক চীৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। আরসোলা কি মাকড়সা ঘর আক্রমণ করিলে, যেরূপ চীৎকার ওঠে, তাহার চেয়েও এ চীৎকারটা অনেক তীক্ষ্ণ ও করুণ। সুতরাং উঠিতে হইল। ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি, বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ছটফট করিয়া চেঁচাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ভাই, যাও শীগ্‌গীর, মেয়েটা বুঝি গেল!

কি হয়েছে?

ওই দেখ, হতভাগী!

দেখিলাম, সম্মুখে, আস্তাবলে, বুলু সেই নতুন ঘোড়াটির গলা জড়াইয়া, তাহার পিঠে আরামে শুইয়া আছে। ঘোড়াটি নীরবে, শান্ত আনন্দে এই শিশুর সুকোমল বাহুবেষ্টন সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে লেজ নাড়িতেছে। পাশে ছকু সহিস, এক হাতে বুলুকে ধরিয়া, আর এক হাতে একটি বড় বাটি।

দৃশ্যটি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিতেছি দেখিয়া, বুলুর মা আমার উপর চটিয়া বলিয়া উঠিলেন,—যাও তুমি শীগ্‌গীর, বল, ওকে নামিয়ে দিতে।

যাচ্ছি, ভয় কিসের! আহা, বাঙ্গালীর মেয়ে ঘোড়ায় চড়েছে, এত বড় দৃশ্য দেখেও তুমি—

ওগো, তোমার ওসব বীরত্ব রাখ, যাও। কি বদ্‌মায়েস ঘোড়া ওটা,—এখনও ওকে গাড়ীতে জুত্‌তে পারে না।

চেঁচাইয়া বলিলাম, ছকু, ওকে নামিয়ে দে শীগ্‌গীর।

না, আমি নাব্‌ব না, বলিয়া বুলু জোরে ঘোড়ার ঘাড়টি আঁকড়াইয়া ধরিল। আমাদের দিকে চাহিতে অবশ্য তাহার সাহস হইল না।

এস লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! যাও তুমি!

আমি গিয়া জোর করিয়া বুলুকে টানিয়া নামাইলাম। তাহাকে

টানিয়া লইতে ঘোড়ার ডাক ও পা ছোঁড়ার বহর দেখিয়া আমারও ভয় হইল। কিন্তু বুলু একটু তীক্ষ্ণ স্বরে, রতন, চুপ্, বলিতেই সেই তেজস্বী চঞ্চল অশ্ব শান্ত মেয়ের মত দাঁড়াইল।

ছকুর হাতে দেখি, আমারই ঘরের একটি বাটি।' বাটিটির দিকে চাহিতেই, বুলু বলিয়া উঠিল, দেখ কাকা, তুমি বলেছিলে ও চা খায় না,—দেখ কতখানি খেয়েছে। দেখ কি সুন্দর খায়, ধরত ছকু!

ছকু মুখের কাছে বাটি ধরিতে কোন ফল হইল না। বুলু আমার কোলে ছিল; সে ছকুর হাত হইতে বাটি লইয়া ঘোড়াটীর মুখে ধরিয়া বলিল,—খা, রতন, খা। তাহার স্নিগ্ধ মিষ্টি ডাকে ঘোড়াটি আনন্দধ্বনি করিয়া চা খাইতে লাগিল। বুলুর মা বারবার ইসারা করিয়া ডাকিতেছিলেন, চলে এস, চলে এস; কিন্তু এ ঘোড়াটিকে সমস্ত চাটুকু না খাওয়াইয়া আসিতে পারিলাম না।

বুলুকে কোলে করিয়া চুপে-চুপে আমার ঘরে ঢুকিলাম। আজ তাহার পিঠে নিশ্চয় একটি পাখা ভাঙ্গিবে। বুলুর মা যখন তাহাকে শাসন করিতে আসিলেন, বুলু অতি স্নিগ্ধ মিষ্টি সুরে বলিল, বা, আমি ত রতনকে চা খাওয়াতে গেছ্‌লুম,—ও বুঝি চা খাবে না, শুধু তুমিই খাবে। সে এমন ভঙ্গীতে এমন সুরে বলিল যে, বুলুর মা হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আর প্রহার করা হইল না বটে, কিন্তু ছকু সহিসের ডাক পড়িল। সে দীর্ঘ সেলাম করিয়া নম্র ভাবে বলিল,—মাইজী, ঘোড়াটা বদমায়েস আছে বটে, এখনও দুরন্ত হয় নি, ওর কাছে ঘেঁসতে আমাদের ডর লাগে, কিন্তু বুলু বাবা ওর কাছে গেলেও একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বুলু বাবাকে কিছু করবে না, ও যে বুলু বাবার লৈড়কা হয়েছে।

বুলুর মা কিন্তু এসব কথায় ভুলিলেন না। তিনি বুলুর দুই কাণ একটু কঠোর ভাবে নাড়িয়া জানাইয়া দিলেন,—তাহার বাহিরে যাওয়া একেবারে

বন্ধ। আস্তাবলে আর যাইতে পারিবে না,—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যত খুসি ঘোড়া দেখিতে পারে।

বিকেলে আসিয়া দেখি মা'র ব্যবস্থাটি এই দুর্দ্দান্ত বৃহৎ অশ্বের ছোট মা-টী স্বীকার করিয়া লয় নাই; সে বাড়ীর সকলের সহিত অসহযোগ করিয়া সমস্ত দিন একা বারান্দার কোণে বসিয়া কাটাইয়াছে; এবং উপবাস করিয়াছে। জলখাবার আসিলে তাহাকে ধরিয়া আনিলাম। কোন মতেই খাইতে চায় না,—আমারও খাওয়া হইল না। ক্ষুধা দুই-জনেরই বেশ পাইয়াছিল, আমার সঙ্গে অভিমান কান্না অনুনয়ের পালা শীঘ্রই সাঙ্গ হইয়া একটা রফা হইল; ঠিক হইল, আমার সঙ্গে সে রতনকে বিকেলে একবার করিয়া দেখিতে যাইবে।

কিন্তু এ ব্যবস্থাও বেশী দিন টিঁকিল না। পাঁচ বৎসরের এক চঞ্চলা বালিকাকে চোখে-চোখে রাখা বড় শক্ত। তার পর, এই বৃহৎ, বলিষ্ঠ, তেজী সুন্দর জন্তুটির প্রতি এই ক্ষুদ্র বালিকার সুকুমার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-ধারাকে বাধা দিতে ব্যথা বোধ হইত। বুলু বারান্দার কোণে স্থির হইয়া বসিয়া আছে,—রতন তাহার দিকে চাহিয়া একটু ডাকিলে, লেজ নাড়িলে, পা দোলাইলে,—সে আর স্থির থাকিতে পারিত না,—তাহার বুক দুলিত, পা নাচিত, সকল প্রকার শাসন প্রহার ভুলিয়া সে আস্তাবলে ছুটিয়া যাইত। ব্যাপারটা বুলুর মায়ের চোখে পড়িলে অবশ্য একটু মুস্কিল হইত। আমাকে বলিতে হইত,—আমি তাহাকে একা যাইতে হুকুম দিয়াছি। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া বুলুকে ধরিয়া আনিতে হইত। ছকু সহিসের কাছে রতনের দুর্দ্দান্ত স্বভাবের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, শান্ত শিষ্ট ব্যবহারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনিয়াও তিনি কিছু আশ্বস্ত হইতেন না।

এই অষ্ট্রেলিয়াবাসী, স্বাধীন, দুর্দ্দান্ত জন্তুটির সহিত এই ছোট বাঙ্গালী মেয়েটির সখ্যতা ধীরে ধীরে বেশ জমিয়া উঠিল। সময় হইলেই আমি

বুলুকে লইয়া ঘোড়াটির কাছে যাইতাম। তাহাদের মিলন-দৃশ্য ও কথাবার্ত্তা বেশ ভাল লাগিত। তাহাদের মধ্যে একটি বাঁধা পরিহাস প্রচলিত ছিল। বুলুকে দূর হইতে দেখিলেই ঘোড়াটি পেছনের একটি পা শূন্যে ছুঁড়িয়া, লেজ নাড়িয়া আনন্দ জানাইত; কিন্তু এই পা'টি ছুঁড়িয়া সে না কি প্রথম দিন গাড়ী ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ওই পা'টি নাড়িলেই বুলু বলিয়া উঠিত, কি রতন, গাড়ী ভাঙ্গবি। রতন তাহার সুন্দর ঘাড়টি দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া জানাইত,—সে একদিন গাড়ীটি চূরমার করিয়া দিবে। ছকু সহিসের কাছ হইতে রতন সম্বন্ধে সে অনেক গল্প জানিয়া লইয়াছিল। আমাদের সন্ধ্যার আসর রতনের নানা গল্প দিয়া সে জমাইয়া তুলিত। রতন কত ঘাস, কত ছোলা খায়, চা খাইতে কিরূপ ভালবাসে; সন্দেশটা সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু সে জিলিপির বড় ভক্ত।

বুলুর মাতার শরীর কিছুদিন হইতে খারাপ হইয়াছিল, ডাক্তাররা বারবার বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা বলাতে, সে বৎসর পূজার সময় দার্জ্জিলিং যাওয়া ঠিক হইল। যাবার সময় বুলুকে সাজাইয়া তাহার মাতা বলিলেন, তোর রতনের সঙ্গে দেখা করবি নি।

যাবার হৈ-চৈ, উৎসাহ, উন্মাদনায় বুলু রতনের কাছ হইতে বিদায় লওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল,—মা মনে করিয়া দেওয়াতে, আমাকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিল। রতনের গলা জড়াইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া, চুমো খাইয়া আদর করিয়া তাহার আর বিদায় লওয়া শেষ হয় না। রতনের জন্য কি কি জিনিষ আনিবে, তাহার তালিকা তাহাকে শুনাইয়া দিল, ছকুকে বারবার সাবধান করিয়া দিল, রতনের যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। ছকুর বকশিস ও রতনের খাবারের জন্য পাঁচটি টাকা আমাকেই দিতে হইল।

দার্জ্জিলিংএ গিয়া ঘোড়া দেখিলেই বুলু বলিয়া উঠিত, কাকা, রতন

হলে বেশ হত,—তার পিঠে কেমন চড়ে বেড়াতুম। ও ঘোড়া বিচ্ছিরি, রতন কি সুন্দর!

তিনমাস পরে যখন দর্জ্জিলিং হইতে ফিরিলাম,—বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াতেই বুলু বলিয়া উঠিল, মা, সে মালগুলো দাও। রতনের জন্য সে চার রংএর চারগাছি মালা কিনিয়াছিল।

সে বিকেলে পাবি।

বা, আমি এখন যে রতনের কাছে যাব।

তাহার মাতা ধমক দেওয়াতে, সে বিমর্ষ হইয়া, শূন্যহাতেই রতনের কাছে যাইবে, ঠিক করিল। কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়া আস্তাবলের দিকে চাহিতেই, সে বিস্মিত, ব্যথিত হইল। আস্তাবলে যেখানে রতন ছিল, সেখানে একখানি প্রকাণ্ড মোটরকার, আর তাহার ওপর যেখানে ছকু সহিসের আস্তানা ছিল, সেখানে এক গালপাট্টা-দাড়ি শিখের মুখ দেখা যাইতেছে।

আমি গাড়োয়ানদের ভাড়া চুকাইয়া দিতেছি,—আমার হাত জোর করিয়া নাড়িয়া করুণস্বরে বুলু বলিল,—কাকা, রতন কোথায়?

ওই, ওখানে দেখ্ না।

নেই—চল না তুমি, রতন কোথায়?

গাড়োয়ানদের ভাড়া চুকাইয়া, আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, রতনের স্থানে এক মিনার্ভা কার।

ক্লান্ত করুণস্বরে বুলু বলিল,—কৈ রতন?

কি সুন্দর মোটরকার দেখ!

বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি! শুধু ওই লোকটা, কি দাড়ি!

বুঝিলাম রতন বিদায় হইয়াছে। চৌধুরীরা যে সে বৎসর লোহার ব্যবসায় লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে, তাহা সকলকে জানাইতে হইলে,

মোটরকার কেনা দরকার। কিন্তু ব্যাপারটা তখন বুলুকে বলিতে বাধ্য বোধ হইল। বলিলাম, রতন এখনও হয়ত আসে নি, কি তাকে নতুন কোন আস্তাবলে রেখেছে,—এখন বাড়ী চল।

বাড়ীতে গিয়া বুলু ভাল করিয়া খাইল না,—সমস্ত বিকেল মালা হাতে করিয়া, রতনের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সন্ধ্যায় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইল, চৌধুরীরা রতনকে বিক্রী করিয়া দিয়াছে,—সে কোথায়, তাহা কেহ জানে না।

বুলু রতনের সেই চুলের গোছা কোন্ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করিল, মালাগুলি দিয়া সেগুলি জড়াইল; সমস্ত সন্ধ্যাটা বারান্দার কোণে আস্তাবলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সেই চুলের গোছা লইয়া সে রাতে বুলু যখন বিছানায় শুইতে গেল,—তাহার মাতা কোন আপত্তি করিলেন না। গভীর রাতে কাঁদিতে-কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। শিশু-হৃদয়ের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে স্মৃতি অতি হাল্‌কা তুলিতে হাল্‌কা রংএ ছবি আঁকে,—শরৎ আকাশের মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত সেখানে বাহিরের জগতের ছবিগুলি ক্ষণিক ছায়া ফেলিয়া মিলাইয়া যায়। সেখানে পুরাতনের জীর্ণ পাতা জমিতে পায় না, নব-নব সুখ, নব-নব আনন্দ ফুলের মত ফুটিয়া ওঠে।

রতনের কথা বুলু ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল। মোটরকারটির প্রতি বিদ্বেষভাব তাহার শীঘ্রই ঘুচিয়া গেল। শিখচালকের সহিত বেশ বন্ধুত্ব পাতাইতে তাহার লজ্জা হইল না। মোটরকারটি যখন রাস্তা দিয়া আসিত, fine, grand বলিয়া হাততালি দিয়া সে হর্ণ বাজাইতে ছুটিত।

সেদিন অসহ্য গরম। ১০৭ ডিগ্রি টেম্‌পারেচার। জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া, মেজেতে পাটি পাতিয়া আমি, বুলু ও তাহার প্রিয় বেড়াল পুস্থু—তিনজনে মিলিয়া তরমুজের সরবৎ খাইতেছি, গা-হাত-পা জ্বলিতেছে,

—ইচ্ছা করিতেছে, এক তরমুজের সরবৎএর সরোবরে বরফের ঘরের মধ্যে থাকা যাইত। পুসুকে সরবৎ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বুলু সহসা বলিয়া উঠিল, কাকা রতন কোথায়?

রতনের নামে মনটা কেমন উদাস হইয়া গেল। এই অসহ্য তাপের মধ্যে অগ্নিবর্ষী দ্বিপ্রহরে কলিকাতার উত্তপ্ত পাথরের পথে সে হয় ত গাড়ী লইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই খসখসে-ঘেরা ঘরে, ইলেকট্রিকের পাখার তলায়, বরফ খাইতে-খাইতে কোন শান্তি, তৃপ্তি হইতেছে না,—আর সেই দুর্দ্দান্ত স্বাধীন তেজস্বী জীবটি এই দুঃসহ অগ্নি-হল্কার মধ্যে না জানি কি দুঃখেই দাসত্বের শৃঙ্খল বহন করিতেছে। রুদ্রের অগ্নিনেত্রের মত জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্নের খর-রবি-দীপ্ত আকাশ হইতে যেন গলিত অগ্নিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। এই গ্রীষ্মের দুপুরে ঘোড়ারা গাড়ী টানিতেছে, গরুরা মহিষেরা বোঝা বহিতেছে, মজুরেরা বাড়ী তৈরী করিতেছে, কুলীরা পথ খুঁড়িয়া পিচ গলাইয়া ঢালিতেছে;—নিষ্করুণ মমতাহীন কর্ম্মচক্রে কাহারও ছুটি নেই। বাহিরের গরমটা, রৌদ্রের তাপ, জ্বালাটা—একবার অনুভব করিতে ইচ্ছা হইল। বুলুকে বলিলাম, তুই পুসুকে ঘুম-পাড়া—আমি একটু ঘুরে আসছি।

সদর দরজা পার হইতেই পিছন হইতে বুলু ডাকিল,—বা, ছাতা নিচ্ছ না, আমি বলে দেব।

সে যে আমার পিছনে-পিছনে নামিয়া আসিয়াছে, দেখি নাই। তাহার এক হাতে সরবৎএর পেয়ালা, আর এক হাতে জাপানী পাখা,—পুসু তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া।

যা, ওপরে যা, আমি আস্‌ছি—বলিয়া আমি মোড়ের দিকে চলিলাম। সূর্য্যের আলোর স্পর্শ বড় সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল না।

একটু অগ্রসর হইতেই মোড়ে একটা হৈ চৈ শব্দে চমকিয়া উঠিলাম।

সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, মোড় হইতে একটা ঘোড়া বেগে ছুটিয়া আসিতেছে,—তাহার পিছনে একদল লোক চেঁচাইতেছে—সামাল, সাবধান—

একটা ঘোড়া ক্ষেপিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে,—নিমেষের মধ্যে সে আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে পারে,—আপনার অজ্ঞাতেই পথ হইতে সরিয়া ফুটপাতে উঠিলাম বটে, কিন্তু এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে দারুণ অগ্নিবর্ষী গগনের তলে, এই তপ্ত পাথরের পথে এক বিদ্রোহী অশ্বের উদ্দীপ্ত, উন্মত্ত মূর্ত্তি, বন্ধন-হারা মত্ত আনন্দময় ছন্দ-হারা ক্ষিপ্রগতির দিকে মন্ত্রমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। নৃত্যময়ী অগ্নিশিখার মত ঘোড়াটা আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তার পর আমাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া যেন মাতালের মত টলিতে লাগিল। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, রাস্তার মধ্যে বুলু দাঁড়াইয়া আছে,—এই বুঝি ক্ষিপ্ত ঘোড়াটা তাহার ওপর গিয়া পড়ে! ঘোড়াটা আপনার উন্মত্ত বেগ থামাইবার চেষ্টা করিয়া সম্মুখের দু পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল,—যেন পিছন হইতে কে লোহার চেনের রাস দিয়া টানিয়া তাহার গতি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আপন উন্মত্ত গতিকে আপনি কে নিমেষে থামাইতে পারে। ঘোড়াটি সোজা ছুটিতেছিল, একটু বেঁকিয়া বুলুর কাছ দিয়া ঘেঁসিয়া গেল; বৃহৎ পাথরে সম্মুখের সোজাপথ রুদ্ধ হইলে গিরিঝর্ণা যেমন বেঁকিয়া বহিয়া যায়, তেমনি বুলুর পাশ দিয়া বেঁকিয়া ঘোড়াটি আমাদের বাড়ীর দেওয়ালে গিয়া ধাক্কা খাইল, মাথাটা দেওয়ালে ঠুকিয়া গেল, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে তীরাহত পাখীর মত ফুটপাথের ওপর লুটাইয়া পড়িল।

যখন সেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, দেখি, বুলু এক হাতে ঘোড়াটির আহত রক্তাক্ত মুখের ওপর পাখার বাতাস করিতে করিতে সরবৎএর পেয়ালিটি মুখের কাছে ধরিয়া করুণ ব্যথিত সুরে বলিতেছে, ও রতন, খা, রতন খা—

ঘোড়াটির গা দিয়া ঘামের ঝরণা বহিতেছে, বুকটা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, রক্তমাখা মাথাটা ফুটপাথের পাথরে ধীরে ধীরে ঘষড়াইতেছে।

বুলু, সর, পালা, দেখ্‌ছিস্ ও ক্ষেপেছে।

না, না, চুপ্, রতন, চুপ্।

রতন শান্ত হইতে চেষ্টা করিল, একটু স্থির হইয়া বুলুর দিকে চাহিল।

রতন, সত্যি গাড়ী ভেঙ্গেছিস্—দুষ্টু—খা, সরবৎ খা—

রাঙা তরমুজের মত রক্তের স্রোত তাহার নাক-মুখ দিয়া ঝরিয়া পড়াতে, বুলু উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল,—অসহ্য যন্ত্রণায় রতন পা ছুঁড়িয়া শুইয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সরে আয় বুলু—মারা যাবি।

বুলু একটু করুণ চোখে রতনের দিকে চাহিল। তার পর, একটু রুদ্ধ বিরক্তির সুরে বলিল—চুপ্, রতন, quiet! quiet!

করুণ উদাস চোখে ঘোড়াটি তাহার দিকে চাহিয়া স্থির হইতে চেষ্টা করিল; তাহার বিদ্রোহদীপ্ত বিদ্বেষবহ্নিজ্বালাময় মধ্যাহ্ন আকাশের মত চোখ আষাঢ় মেঘের মত কালো হইয়া আসিল। তাহার প্রথম দিনের করুণোজ্জ্বল চাউনির কথা মনে পড়িল,—বনের স্বাধীন উল্লাসময় জীবন, মুক্ত বিচরণ, কত ছবি—নিমেষে ভাসিয়া যেন মিলাইয়া গেল।

বুলু আবার তাহার কাছে গিয়া সরবৎএর পেয়ালা ধরিল, খা—রতন খা। বেড়ালটি ব্যথিত চোখে চাহিয়া মিউ মিউ করিয়া বুলুর অনুনয়ের সমর্থন করিল। রতন একবার তাহার সুন্দর ঘাড়টি একটু তুলিয়া পেয়ালায় মুখ দিল। লেজ নাড়িয়া পিছনের পা একটু নাচাইল। আবার ছটফট করিয়া উঠিল, নাক-মুখ দিয়া তপ্ত রক্তের স্রোত ঝরণাধারার মত বাহির হইয়া আসিয়া পেয়ালার রাঙা ঠাণ্ডা সরবৎ এর ওপর পড়িয়া বুলুর হাত পা ভাসাইয়া দিল।

বুলু উঠিয়া বকুনী ও ব্যথার সুরে ডাকিল—রতন !

রতন আর একবার অসহ্য যন্ত্রণায় পা ছুঁড়িয়া মাথা ঘষড়াইয়া ছটফট, করিয়া চিরদিনের মত শান্ত হইয়া গেল।

উপরে মধ্যাহ্নের শুষ্ক আকাশ খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, এবং অগ্নিতপ্ত পথের ওপর এই মৃত ঘোড়াটির চারিদিকে আমাদের সকলের চোখ অশ্রুতে ভিজিয়া গেল।